বাংলা সহপাঠ

নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক
অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ্ খান
অধ্যাপক নূরজাহান বেগম
অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান
অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
ড. শোয়াইব জিবরান

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০২২
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

নবম ও দশম শ্রেণির **বাংলা সহপাঠ** পাঠ্যপুস্তকটিতে উপন্যাস ও নাটক এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে, শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের এই দুই বিশেষ শাখার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা লাভ করতে পারে। একটি অন্যায় যুদ্ধ কীভাবে ধীরে ধীরে জনযুদ্ধে পরিণত হলো–উপন্যাসটি পাঠের মাধ্যমে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। নাটকটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং কুসংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী হয়ে উঠবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।
পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা

ক. উপন্যাস কী?

‘উপন্যাস’ সাহিত্যের একটি সংজ্ঞা বা পরিভাষা। সাহিত্যের অনেকগুলো রূপ। তার মধ্যে কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্প – এ পাঁচটি প্রধান। জনপ্রিয়তার দিক থেকে এবং জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকে কার্যকরভাবে উপস্থাপনার সক্ষমতায় উপন্যাসকে অনেকে আধুনিক যুগের সবচেয়ে সফল সাহিত্যরূপ বলে মনে করেন।

উপন্যাসে কাহিনি থাকে। কাহিনি ঘটনার সমষ্টি। নির্দিষ্ট স্থান ও কালের মিলনবিন্দুতে এক-একটি ঘটনা ঘটে। এ ধরনের অনেকগুলো ঘটনার সমবায়ে কাহিনি গড়ে ওঠে। তবে কাহিনিমাত্রই উপন্যাস নয়। উপন্যাসে কাহিনিকে বিভিন্নভাবে সাজানো হয়। পরের ঘটনা আগে আসে, আগেরটা পরে। বিভিন্ন উপকাহিনি বা সমান্তরাল কাহিনি যুক্ত হয়। কাহিনির এ বিন্যাস বা সজ্জাকে বলা হয় প্লট। কাহিনিতে যখন একের পর এক ঘটনা ঘটে, তখন আমরা একটি ঘটনাকে আরেকটি ঘটনার সাপেক্ষে পাঠ করি। আমাদের মনে এ উপলব্ধি হয় যে, একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার সাথে কার্যকারণসূত্রে যুক্ত। অর্থাৎ, একটির কারণেই ফল হিসেবে অন্য একটি ঘটনা ঘটছে। এ কথা বিবেচনায় রাখলে কাহিনিসজ্জা বদলে ফেলার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। যদি লেখক তুলনামূলক পরে সংঘটিত একটি ঘটনা আগে বর্ণনা করেন, তাহলে ঘটনাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক যাবে বদলে। সেক্ষেত্রে তৈরি হবে ভিন্ন ধরনের উপলব্ধি। কাহিনিবিন্যাসের এ ধরনের কৌশল ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক কোনো ঘটনা বা মুহূর্তকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। এর মধ্য দিয়ে পাঠকের মনের প্রতিক্রিয়াকে বিশেষভাবে পরিচালিত করেন। এ কারণেই উপন্যাসে কাহিনির তুলনায় প্লটকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ঘটনার অবলম্বন চরিত্র। সাহিত্য মানুষের জীবনেরই বিচিত্র প্রকাশ। নিখিল মানবসমাজের অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর জীবনসত্য উন্মোচিত হয় সাহিত্যে। কিন্তু তার প্রধান অবলম্বন ব্যক্তি। ব্যক্তি-মানুষের সূত্র ধরেই সাধারণভাবে সমষ্টির কথা উঠে আসে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখানে সমগ্র কাঠামোর মধ্যে ক্রিয়াশীল ব্যক্তি-মানুষের ছবি অঙ্কিত হয়। ব্যক্তিকে অবলম্বন করেই ঘটনা সংঘটিত হয়। আবার ঘটনার মধ্য দিয়ে বা ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তির রূপান্তর ঘটে। ফলে ব্যক্তির মধ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্ম দিকগুলো প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে সাধারণভাবে এ ব্যক্তিই ‘চরিত্র’ হিসেবে অভিহিত হয়।

তবে চরিত্র কথাটার অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। একজন মানুষকে আমরা কতগুলো বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করি। আমরা ব্যক্তির মূল্যায়ন করি, এবং তার কোনো বৈশিষ্ট্য মানুষের বৃহত্তর ভালো-মন্দের ধারণার সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত, তা বিবেচনা করি। উপন্যাসে ব্যক্তি কিন্তু অনেক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। উপন্যাসের ব্যক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের বৃহত্তর মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য বা মানুষের গভীরতর প্রকৃতির বোধ জন্মে। এদিক থেকে একজন লেখক মানুষের কোন স্বভাব বা বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়ে চরিত্র তৈরি করছেন, তা বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠে। যেমন, কোনো মানুষ হয়ত কোনো আদর্শের প্রতি খুবই অনুগত, কেউ হয়ত ভীষণ পারিবারিক, অন্য কেউ খুব বস্তুবাদী কিংবা প্রবৃত্তিপরায়ণ। একজন লেখক এ ধরনের কোন বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর চরিত্র সৃজন করেন, তার ভিত্তিতে আমরা লেখকের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারি। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, লেখক তাঁর জীবনদৃষ্টি অনুযায়ীই আসলে চরিত্র সৃষ্টি করেন। কাজেই চরিত্র কেবল ঘটনার অবলম্বন নয়; কেবল উপন্যাসের একটি উপকরণ নয়; লেখকের জীবনদৃষ্টিরও যথার্থ বাহন।

শিল্পকলা বা আর্টের যে কোনো শাখাতেই জীবন সম্পর্কে শিল্পীর মূল্যায়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। বস্তুত, প্রধানত এ নিরিখেই কাউকে আমরা বড় শিল্পী বলে থাকি। উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। ঔপন্যাসিক কাহিনি বুননের জন্য যেসব ঘটনার সন্নিবেশ ঘটান, যেভাবে চরিত্র সাজিয়ে তোলেন, কিংবা ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে যে পরিণতিকে পৌঁছান, তার ভিতর দিয়ে লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। অন্যভাবে বলা যায়, লেখকের জীবনদৃষ্টির ভিত্তিতেই আসলে কাহিনি, চরিত্র বা পরিণতি গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়। উপন্যাসের ভাষা ও অলঙ্কারের ব্যবহার কেমন হবে, কোন ভঙ্গি বা স্বরে লেখক একটি ছোট ঘটনা বা সংলাপ রচনা করবেন, কিংবা ভালো-মন্দের বোধগুলো তিনি কীভাবে নির্ণয় করবেন, তার সবকিছুই নির্ধারিত হয় ওই জীবনদৃষ্টির নিরিখে। কাজেই বিশিষ্ট জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসের অনিবার্য অঙ্গ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে এবার আমরা উপন্যাসের সংজ্ঞায়ন করতে পারি। সংজ্ঞায়ন বলতে বোঝায় কোনো কিছুকে চিহ্নিত করা। এর দুটি দিক। একদিকে সংজ্ঞায়নে জিনিসটি কী তা বলা হয়, অন্যদিকে কী নয় তাও বলা থাকে। যেমন আমরা যদি বলি, উপন্যাস সাহিত্যের একটা রূপ, তাহলে একই সাথে বলা হল যে, উপন্যাস সাহিত্যের বাইরের কিছু নয়। এখন সাহিত্যেরও নানা রূপভেদ আছে। কাজেই উপন্যাসের সংজ্ঞায়ন করতে গেলে অন্য রূপগুলোর সাথে এর ফারাক কোথায়, তাও স্পষ্ট করতে হবে। কবিতার সাথে অন্য সাহিত্যরূপগুলোর প্রধান পার্থক্য শব্দের অর্থ-নির্ণয়ের পদ্ধতিতে—কবিতায় সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থের বিচ্যুতি ঘটে এবং নতুন অর্থ তৈরি হয়। তাছাড়া সাধারণ ভাষার সাথে কাব্যিক ভাষার সুর ও স্বরগত পার্থক্যও ঘটে। উপন্যাসে যেখানে ঘটনা বর্ণনা করা হয়, নাটকে সেখানে ঘটনা ক্রিয়ামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়। ছোটগল্পের সাথে উপন্যাসের বেশ মিল আছে। তবে প্রধান পার্থক্য এই যে, ছোটগল্পে প্রকাশিত হয় জীবনের কোনো একটি দিক বা কোনো বিশেষ মুহূর্ত, আর উপন্যাস প্রকাশ করতে চায় জীবনের সামগ্রিকতা। জীবনদৃষ্টি অবশ্য সবগুলো সাহিত্যরূপেরই সাধারণ উপাদান। এসব বিবেচনায় উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ হতে পারে এরকম: উপন্যাস প্রধানত গদ্যে লেখা বর্ণনামূলক সাহিত্যরূপ, যেখানে ঘটনা ও কাহিনির বিশেষ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-চরিত্র অবলম্বনে জীবনের সামগ্রিকতা প্রকাশের আয়োজন করা হয়, এবং সবকিছু মিলে লেখকের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির প্রকাশ ঘটে।

উপন্যাসের বিষয় হতে পারে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম—এক কথায় মানুষের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো কিছু। বিষয়ের সাথে সাথে ভাষা এবং ভঙ্গিরও যথেষ্ট বদল ঘটে। যেমন, ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনেকসময় ইতিহাসের সত্য রক্ষার দায় থাকে; আবার আঞ্চলিক জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি অনুগত থাকতে হয়। কিন্তু ভাষা-ভঙ্গি যতই আলাদা হোক, উপন্যাসের মূল উপাদান ও স্বভাব অক্ষুণ্ণ থাকে।

উপন্যাসকে প্রায়ই আধুনিক জীবনের সাহিত্যরূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। মানুষের যাপিত জীবনের সামগ্রিকতা উপস্থাপনের সক্ষমতার জন্য উপন্যাসের এই খ্যাতি। ষোল শতকে ইউরোপে আধুনিকতার সূত্রপাত হওয়ার সময়েই উপন্যাসচর্চা শুরু হয়েছে বলে বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করেন। পুরনো দুনিয়ায় জীবনের সমগ্রতা ধারণের এ কাজ করত মহাকাব্য। মহাকাব্যের বিষয় ছিল সুদূর অতীতের কল্পিত জীবন। বিপরীতে, উপন্যাসের জগৎ 'বর্তমানময়'। মানুষ যেমন বহুবিচিত্র, তেমনি বিচিত্র তার ভাষা, স্বভাব ও আচরণ। এ বৈচিত্র্যকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে জীবনের বিচিত্র রূপ ও সামগ্রিকতা প্রকাশের আশ্চর্য সক্ষমতা আছে উপন্যাসের। এ দিক থেকে বিশ শতকের শিল্পমাধ্যম সিনেমার সাথে উপন্যাসের তুলনা করা চলে। এ জন্যই হয়ত প্রচুর উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ হয়। উনিশ শতকেই উপন্যাস শিল্পরূপগত দিক থেকে সিদ্ধির চূড়ায় পৌঁছেছিল। বিশ শতকে সে ধারা অব্যাহত থেকেছে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কথাটা অংশত সত্য। একুশ শতকেও সম্ভবত সিনেমার সমান্তরালে উপন্যাসের এ জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

খ. বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আগেই বলেছি, উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে মাত্র দেড় শত বছর আগে ইংরেজি উপন্যাসের আদলে বাংলা উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। তবে অনেকেই এর বীজ খুঁজে পেয়েছেন প্রাচীন সংস্কৃত কাহিনি-কাব্য, পঞ্চতন্ত্র ও বৌদ্ধ জাতকের গল্প, মধ্যযুগের রূপকথা, ময়মনসিংহ গীতিকা, রোমান্টিক কাহিনি-কাব্য, নাথ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, আরব্য উপন্যাস, লোকগাথা প্রভৃতি রচনায়। যাই হোক, আধুনিক কালের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের কোনো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত ঘটলে কলকাতাকে কেন্দ্র করে একদিকে ব্যাপক নগরায়ণ, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে মানবিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,

শিক্ষা ও সাময়িক পত্রের প্রসার, সমাজ সচেতনতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের দ্বারা সমাজ ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে। নতুন কালের মানুষ নতুন সমাজের কথা প্রকাশের গরজ অনুভব করতে থাকে। এরই প্রভাবে উদ্ভব ঘটে উপন্যাসের।

অনেকে মনে করেন, হানা ক্যাথারিন মুলেন্সের (১৮২৬-৬১) লেখা *ফুলমনি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২) হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। কেউ কেউ আবার প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮)-এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। তবে সবাই মেনে নিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা। উপন্যাসের সমস্ত লক্ষণ তাঁর উপন্যাসে দেখা যাবে। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। লিখেছেন সামাজিক উপন্যাস। সমাজের নানা অসংগতি, ব্যক্তির কামনা, বাসনা, বেদনা ও দ্বন্দ্বের কথা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। কাহিনি বর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ, ভাষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্য দেখিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল* ইত্যাদি।

বাংলা উপন্যাসের আরেক কীর্তিমান লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। উপন্যাস রচনাতেও তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয়। ব্যক্তির মন ও মননের অপূর্ব সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে আমরা দেখেছি সমাজের চাপে ব্যক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তাঁর চরিত্রগুলো সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পাওয়া গেল নতুন কালের নারী ও পুরুষকে। মানবিকতার দ্বারা দীক্ষিত হয়ে তারা সামাজিক সংস্কারকে অস্বীকার করছে। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে অর্জন করতে চাইছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে চাইছে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। কাহিনি নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ, ভাষার নিরীক্ষা, যুগের প্রতিফলন, মনোবিশ্লেষণ ইত্যাদি দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা বহুল আলোচিত উপন্যাস *চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়* ও *যোগাযোগ*।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙালির গৃহকাতরতা এবং আবহমান পারিবারিক আবেগের ওপর ভর করে উপন্যাস লিখেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। অর্জন করেছিলেন ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেবদাস, দেনা-পাওনা, শ্রীকান্ত* ইত্যাদি।

বাংলা উপন্যাসের জগতে এরপর আবির্ভাব ঘটে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের– তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬)। আবহমান বাংলার প্রাকৃতিক মাধুর্য, পল্লির স্নিগ্ধশান্ত রূপ, অরণ্য, পাহাড় যে এখনো আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিভূতিভূষণের লেখা *পথের পাঁচালী*, *অপরাজিতা*, *আরণ্যক* ইত্যাদি উপন্যাস পড়লেই তা বোঝা যায়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে পাই অতীতের গৌরব আর ঐশ্বর্য হারানো জমিদার, নিম্নশ্রেণির বিচিত্র পেশার সাধারণ মানুষের কথা। এই মানুষজন আমাদের চিরচেনা বৈষ্ণবী, কবিয়াল, যাত্রাশিল্পী, মৃৎশিল্পী, বেদে, সাপুড়ে, বাজিকর, ঝুমুর দলের নাচিয়ে ইত্যাদি। উঠতি শিল্পমালিক আর শ্রমিকদের জীবনের ছবিও পাওয়া যাবে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, ধাত্রীদেবতা, হাসুলী বাঁকের উপকথা, কবি* প্রভৃতি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: (১) মার্কসবাদের পটভূমিতে ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব এবং (২) ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে নর-নারীর জটিল সম্পর্কের বিন্যাস। ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা জর্জরিত মানুষের জীবনের ছবি তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে গ্রামীণ বাস্তবতার চিত্র। *দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, চিহ্ন, শহরতলী*

প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। বাংলা উপন্যাস আরও যাঁরা লিখে খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, দেবেশ রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ।

গ. বাংলাদেশের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি দেশের জন্ম হয়। পূর্ব বাংলায় সূচনা ঘটে নতুন এক সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার। এই সময়েই যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশের উপন্যাসের। শ্রেণিকরণ করলে বাংলাদেশের উপন্যাসকে এভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

(১) **গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত উপন্যাস :** সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু*, *কাঁদো নদী কাঁদো*, *চাঁদের অমাবস্যা*, আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ি*, জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে*, আবদুল গাফফার চৌধুরীর *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান*, শওকত ওসমানের *জননী*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*, হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি*, সৈয়দ শামসুল হকের *মহাশূন্যে পরান মাস্টার*, সেলিনা হোসেনের *দীপান্বিতা* ইত্যাদি।

(২) **নগর ও গ্রামের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস :** আলাউদ্দিন আল আজাদের *ক্ষুধা ও আশা*, শহীদুল্লাহ্‌ কায়সারের *সংশপ্তক*, সরদার জয়েন উদ্দিনের *অনেক সূর্যের আশা*, আবুল ফজলের *রাঙাপ্রভাত*, আনোয়ার পাশার *নীড় সন্ধানী* ইত্যাদি।

(৩) **নগর জীবনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস :** আবুল ফজলের *জীবন পথের যাত্রী*, রশীদ করীমের *উত্তম পুরুষ* ও *প্রেম একটি লাল গোলাপ*, আবু রুশদের *সামনে নতুন দিন*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই*, শওকত আলীর দক্ষিণায়নের দিন ইত্যাদি।

(৪) **আঞ্চলিক ও বিশেষ জীবনধারার উপন্যাস :** আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলি*, শহীদুল্লাহ্‌ কায়সারের *সারেং বউ*, শামসুদ্দীন আবুল কালামের *কাশবনের কন্যা*, আবু ইসহাকের *পদ্মার পলিদ্বীপ*, সরদার জয়েনউদ্দিনের *পান্নামতি*, শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, সেলিনা হোসেনের *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ইত্যাদি।

(৫) **মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক উপন্যাস :** আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, সৈয়দ শামসুল হকের *দেয়ালের দেশ* ও *এক মহিলার ছবি*, শওকত আলীর *পিঙ্গল আকাশ*, মাহমুদুল হকের *খেলাঘর* ইত্যাদি।

(৬) **ঐতিহাসিক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস :** আবু জাফর শামসুদ্দিনের *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* ও *পদ্মা মেঘনা যমুনা*, শামসুদ্দীন আবুল কালামের *আলম গড়ের উপকথা*, সত্যেন সেনের *অভিশপ্ত নগরী*, আনোয়ার পাশার *রাইফেল রোটি আওরাত*, শওকত ওসমানের *জলাঙ্গী*, রিজিয়া রহমানের *বং থেকে বাংলা*, মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন*, হাসান আজিজুল হকের *বিধবাদের কথা*, সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেড* ও *গায়ত্রী সন্ধ্যা*, হুমায়ুন আহমেদের *আগুনের পরশমনি*, *জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প*, ১৯৭১ ইত্যাদি।

এই বিভাজন ছাড়াও বয়সভেদে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা। ফলে তাঁরা যেমন বড়দের জন্য উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন ছোটদের জন্যও।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বিচিত্র ধারায় বাংলাদেশের উপন্যাস বিকশিত হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের জীবন ও শহুরে জীবন, ব্যক্তিক সংগ্রাম ও জাতিগত সংগ্রাম, ইতিহাস ও রাজনীতি– সবকিছুই বাংলাদেশের উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। চরিত্রচিত্রণ, ভাষা, আখ্যানশৈলী ইত্যাদি নানা দিক থেকে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা।

ঘ. ঔপন্যাসিক পরিচিতি

হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার ও টিভি-নাট্যকার। ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর তিনি নেত্রকোনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার কর্মসূত্রে দেশের নানা শহরে তাঁর শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয়। এ কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনাও হয় বিভিন্ন স্কুলে। পরে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে বিএসসি (অনার্স) ও এমএসসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৩ সালে পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭৩ সাল থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে তিনি সার্বক্ষণিক সাহিত্যচর্চা ও নাটক-সিনেমা নির্মাণে মনোনিবেশ করেন।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের সাথে হুমায়ূন আহমেদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। বিশেষত বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকের নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র অঙ্কনে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তার তুলনা বিরল। প্রধানত গল্প, উপন্যাস ও নাটক-সিনেমায় জীবনের স্বরূপ উন্মোচনের কাজটি তিনি করেছেন। এছাড়া বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, শিশু-কিশোর সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনি ও আত্মজৈবনিক রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। সাবলীল গদ্যভঙ্গি, বহুমাত্রিক হাস্যরস এবং বিষয়গত বৈচিত্র্য তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।

কথাসাহিত্যিক ও নাট্য-নির্মাতা হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা কিংবদন্তি হয়ে আছে। বাজারের চাহিদা মেটাতে জনপ্রিয় ধাঁচের বহু গদ্য লিখেছেন তিনি। তবে তাঁর কালোত্তীর্ণ রচনার পরিমাণও অনেক। তিনি একজন নিপুণ গল্পকার। একরৈখিকতা এবং সাংকেতিকতা রক্ষা করে জীবনের বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে তাঁর অনেকগুলো চমৎকার ছোটগল্পে। বড় উপন্যাস বেশ কয়েকটি লিখলেও তাঁর সাফল্য ও সিদ্ধি এসেছে মূলত ছোট আকারের উপন্যাস বা নভেলায়।

এ ধরনের রচনার মধ্যে 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'অচিনপুর', 'ফেরা', 'এই বসন্তে', 'প্রিয়তমেষু', 'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ', 'গৌরীপুর জংশন', 'চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক', '১৯৭১', 'অনিল বাগচীর একদিন', 'আগুনের পরশমণি', 'আমার আছে জল', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'জনম জনম', 'দ্বৈরথ', 'নবনী', 'নি', 'শূন্য' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'কবি', 'জোছনা ও জননীর গল্প', 'মধ্যাহ্ন', 'মাতাল হওয়া', 'লীলাবতী', 'বাদশা নামদার' প্রভৃতি তুলনামূলক বৃহৎ পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। এছাড়া তিনি জনপ্রিয় চরিত্র হিমু, মিসির আলি ও শুভ্রকে কেন্দ্রে রেখে অনেকগুলো কাহিনি রচনা করেছেন; লিখেছেন বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি তথা সায়েন্স ফিকশন।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি-জগতে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন এক বর্ণাঢ্য চরিত্র। একুশের বইমেলা তাঁকে ঘিরে উৎসবের বাড়তি আমেজ পেত। তাঁর নাটক ও সিনেমা প্রায়ই আলোড়ন তুলত বৃহত্তর ভোক্তা-সমাজে। দেশে-বিদেশে তিনি বিপুলভাবে নন্দিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার সাথে দেশ ও মানুষের প্রতি নিঃশর্ত অঙ্গীকার এবং এক উদার ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর সাফল্যের ভিত্তি। ২০১২ সালের ১৯ জুলাই গুণী এই লেখক মৃত্যুবরণ করেন।

ঙ. উপন্যাসের আলোচনা: ১৯৭১

১৯৭১ উপন্যাস সম্পর্কে বাজারে এক গল্প প্রচলিত আছে। হুমায়ূন আহমেদ নিজেই এ গল্প প্রচার করেছেন। প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাককে তিনি দিয়েছিলেন বইটির এক কপি। রাজ্জাক নাকি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, যে বইয়ের নাম ১৯৭১, তার পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র সত্তর? সপ্তাহখানেক পরে বাসায় ডেকে নিয়ে হুমায়ূনকে তিনি নাকি একপ্রস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছেন: নিজের মতো লিখবেন, কারো কথা শুনবেন না।

আহমদ ছফা অধ্যাপক রাজ্জাককে নিয়ে *যদ্যপি আমার গুরু* নামে যে বিখ্যাত বই লিখেছেন, তাতে শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্পর্কে রাজ্জাকের দৃষ্টিভঙ্গির কতক পরিচয় পাওয়া যায়। জয়নুলের গরু গাড়ি তিনি নাকি ভীষণ পছন্দ করতেন। বলেছেন, এই ছবিতে আকার আর দূরত্বের যে সমানুপাত ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে, তা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এ তথ্য থেকে প্রফেসর রাজ্জাকের শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে যে ধারণা হয়, তাতে নিশ্চিত করে বলা যায়, তাঁর ১৯৭১ পছন্দ হওয়ারই কথা। বস্তুত, বাস্তববাদী ভঙ্গিতে স্থান ও কালের নিপুণ সমবায়ে চরিত্র ও ঘটনাকে কব্জায় রেখে হুমায়ূন এ উপন্যাসের কাহিনিকে যেভাবে প্রায় অভাবনীয় পরিণতিতে নিয়ে গেছেন, তা মহৎ সাহিত্যেরই লক্ষণ।

তুলনামূলক ছোট পরিসরে কম কথায় ইশারার গভীরতা সৃজনে হুমায়ূনের নৈপুণ্য বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭১ সে ধরনের রচনার এক সফল উদাহরণ। ফলে উপন্যাসটি-যে রাজ্জাক পছন্দ করতে পারেন, তা অনুমান করা কঠিন নয়। অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন এই: এ রচনা প্রসঙ্গে তিনি অন্যের উপদেশ গ্রহণ না করার উপদেশ কেন দিলেন?

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে রাজ্জাকের উপদেশের গুরুত্ব বুঝতে হবে। একদিকে পার্টি রাজনীতির বিষ, অন্যদিকে সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের কপটতা – এ দুইয়ের বিশৃঙ্খল সমাবেশে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধচর্চার ধারা বেশ কতকটা এলোমেলো। এ ধরনের পরিস্থিতি শিল্পসম্মত মনোযোগের অনুকূল নয়। এমতাবস্থায় ব্যক্তিত্ববান দৃষ্টিভঙ্গিই কেবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উপন্যাসের পরিণতি পেতে পারে। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, এ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের যে আবহ তৈরি হয়েছে, তা তিনি পছন্দ করেছেন। অন্যদিকে তিনি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তিত্বও স্বীকার করেছেন।

১৯৭১ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, এটি প্রাথমিকভাবে যুদ্ধের কাহিনি, মুক্তিযুদ্ধের নয়। মুক্তিযুদ্ধটা আবিষ্কৃত হয়েছে পরে, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক লেখালেখির এটা অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা। একেবারে ছক কষে – মাটি, মানুষ, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যনির্মিত অবকাঠামো এঁকে – হুমায়ূন বাংলার এক নিভৃত গ্রামকে বানিয়ে তুলেছেন যুদ্ধের ময়দান। কৌশলটা চলচ্চিত্রের। বিবরণের চিত্রধর্মিতা, চরিত্রের আগমন-তিরোভাব-ক্রিয়া, পটভূমির ফটোগ্রাফিক নির্মাণ সিনেমার কৌশলকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। চোখ তো বটেই, কানের ব্যবহারেও পাই সে একই কৌশলের ছাপ।

অন্ধ মীর আলি যেভাবে শব্দ শুনে সাড়া দেয়, তার ভঙ্গি বর্ণনামূলক নয়, চলচ্চিত্রীয়। গুলির শব্দের বর্ণনাগুলোও তাই। লেখক নিজের জিম্মায় জানাচ্ছেন না যে, গুলি হয়েছে; বরং বলছেন, উপস্থিত লোকেরা এদিক থেকে বা ওদিক থেকে গুলির শব্দ শুনেছে। নিঃসন্দেহে সামরিক অভিযানের আবহ নির্মাণ এবং সিরিয়াসনেসের শৈল্পিক প্রয়োজনেই এই বাড়তি বাস্তববাদী নৈপুণ্য আমদানি করেছেন লেখক।

যুদ্ধটা অবশ্য একপক্ষীয়। অন্যপক্ষ মাঠে অনুপস্থিত। মাঠটা কিন্তু আছে; আর সে মাঠে আছে অন্যের ভূমি, ভূমিতে ক্রিয়াশীল ও বসবাসরত জনগোষ্ঠী। এ মাঠে যুদ্ধ মানেই নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ঝাঁপিয়ে পড়ার নানা কলা আর ছলা। পেছনের জঙ্গলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একদল সৈন্য লুকিয়েছিল কি না, তাদের

সাথে বন্দি মেজর বখতিয়ার ছিল কি না, কিংবা তাদের আহত কয়েকজনকে কৈবর্তপাড়ার লোকেরা আশ্রয় দিয়েছিল কি না, সেসব কথা কোথাও পষ্ট করা হয়নি। প্রতিটি সম্ভাবনাই আছে। আবার এমনও হতে পারে যে, এ ধরনের কোনো ঘটনাই নীলগঞ্জে ঘটেনি। কিন্তু দখলদার বাহিনী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক পরিকল্পিত অভিযানে নেমেছে নীলগঞ্জের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তাহলে অভিযান শেষ করে চলে গেলেই হয়।

কিন্তু না। তা হবার নয়। প্রতিটি যুদ্ধেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি কিছু অসাধারণ বিশিষ্টতা থাকে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক বিশিষ্টতা এই যে, এখানে দূর থেকে উড়ে এসে এক আগ্রাসী বাহিনী হামলা চালাবে এমন এক অঙ্গনে, যার উপর তার কোনো সমর্থনজনিত অধিকার নেই। সমর্থন না থাকা এবং সমর্থন আদায় করতে না চাওয়া অথবা সমর্থন আদায় করতে পারার সম্ভাবনা না থাকা এ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা।

মেজর এজাজ আহমেদের ক্ষোভ ছিল। তার বন্ধু বন্দি হয়েছে বিরোধী জোয়ানদের হাতে। কিন্তু সে ক্ষোভ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে সাধারণ মানুষের উপর অযৌক্তিকভাবে আছড়ে পড়তে পারে না। দ্বিপক্ষীয় যুদ্ধ হলে অন্তত প্রাথমিকভাবে এমনটা হতো না। একপক্ষীয় আরোপণমূলক যুদ্ধ বলেই হয়েছে। ওই ক্ষুদ্র বাহিনীর অধিনায়ক এজাজ আসলে নিশ্চিত হতে পারছিল না, গ্রামবাসীর সাথে লুকিয়ে থাকা সেনাদের কোনো যোগাযোগ আছে কি না। যদি নাও থাকে, তাহলেও খুবই সম্ভব যে, কোনো লড়াই শুরু হওয়া মাত্রই নীলগঞ্জের পুরো প্রাঙ্গণ জনমানুষসহ দাঁড়িয়ে যাবে তার বিরুদ্ধে।

ফলে তাকে ছক কষতে হয়েছে পুরো পরিস্থিতিটাকেই বিরোধীপক্ষ ধরে নিয়ে। তার মানেই হল, এই যুদ্ধে ময়দানের যুদ্ধের চেয়ে ময়দানের বাইরের যুদ্ধ মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; আর মেজর এজাজকে সে লড়াইটাও লড়তে হয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেখানে যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নাই, সেখানে যুদ্ধের যে কোনো পদক্ষেপই অন্যায্য হতে বাধ্য। ফলে এজাজ যতই এগিয়েছে ততই জড়িয়েছে অন্যায় যুদ্ধে।

মেজর এজাজ এ উপন্যাসের সবচেয়ে সুচিত্রিত চরিত্রগুলোর একটি। হুমায়ূন আহমেদের নিরাসক্তি এবং সুমিতি এতটাই প্রত্যয়ী যে, হানাদার বাহিনীর অন্যায় যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী একটি চরিত্রকে তিনি কোনো প্রকার বিদ্বেষ ছাড়াই অঙ্কন করে যান, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এটা আসলে ঔপন্যাসিকের প্রাথমিক গুণ। উপন্যাসের দিক থেকে বরং দেখা দরকার, এরকম সুঅঙ্কিত একটা চরিত্র শেষ পর্যন্ত কী ধরনের জরুরি দায়িত্ব পালন করে। উপন্যাসের মেজর এজাজ কাকুল মিলিটারি একাডেমির কৃতী ক্যাডেট। বাড়ি পেশোয়ারের এক অখ্যাত গ্রামে। তার গাঁয়ের নাম রেশোবা। এসব কথাবার্তা খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই হুমায়ূন বলে নেন উপন্যাসের শুরুর পরিচ্ছেদেই। উপন্যাস-পাঠকরা হয়তো বেশ খানিকটা অস্বস্তি বোধ করবেন প্রথম পরিচ্ছেদের মীর আলির পরিচয়জ্ঞাপক অংশেও। উপন্যাসের 'মূল ঘটনা'র বেশ বাইরের জিনিস মনে হতে পারে ওই অংশকে, এমনকি মীর আলি সম্পর্কিত অন্য অংশগুলোকেও। কিন্তু উপন্যাসটির ছোট্ট আয়তনের কথা মাথায় রাখলে ধারণা করা সম্ভব, এ অংশগুলো মূলের মধ্যেই পড়ে; আর তাতে হয়তো আমাদের আরেকবার নতুন করে ভেবে দেখতে হয়, আদৌ মুক্তিযুদ্ধের মূল অংশ কী কী।

মেজর এজাজের কথাই ধরা যাক। এজাজ যদি বেশ রূপবান তরুণই হয়, যদি সে অখ্যাত এক গ্রাম থেকে উঠে আসা জোয়ানই হয়, আর তার নিজের কথামতো ওই রেশোবা গ্রামে তার অন্ধ পিতা নীলগঞ্জের মীর আলির মতোই বাড়ির দরোজায় বসে থেকে থাকে, তাহলে একথাও বলা যাবে, এ ব্যক্তি জন্মসূত্রে খারাপ স্বভাবের নয়। তার অবস্থান ও কর্মকাণ্ডকে ব্যক্তিগত স্বভাব হিসেবে না দেখে কাঠামোগত সন্ত্রাস হিসেবে দেখার এক জোর

তাগিদ অনুভূত হবে। তাতে উপরিকাঠামোর বেশ কিছু উপাদান মুক্তিযুদ্ধের কাঠামোগত সন্ত্রাসের অন্যতম উৎস হিসেবে আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। এর প্রধানটি নিশ্চয়ই জাতিগত ঘৃণা। এজাজ তার সহচর রফিককে কোনো রাখঢাক না রেখেই বাঙালির জাতিগত ঊনতা বিষয়ে তার এবং তাদের নিশ্চয়তার কথা বলেছে। বাঙালি মুসলমানের মুসলমানত্ব যে মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়, বরং তারা যে প্রায় হিন্দুর কাছাকাছি, এ বিষয়েও মেজর এজাজ কোনো অনিশ্চয়তা রাখেনি। আর, এগুলো যে যুদ্ধকালীন আগ্রাসী পক্ষের প্রধান আদর্শিক অস্ত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে ওই পক্ষের একজন সেনাপতি হিসেবে এজাজের কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধকৌশলও এসব ধারণার বহিঃপ্রকাশ হওয়ার কথা। প্রশ্ন হল, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিজাত তৎপরতার ফল কী হতে পারে?

ছোট্ট গ্রাম নীলগঞ্জের ছোট্ট জনবসতির উপর এসবের প ণতি নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ১৯৭১ উপন্যাসে। লেখক প্রথমেই শ্রেণি, পেশা, শিক্ষা ও ক্ষমতাসম্পর্কের ভিত্তিতে ওই অঞ্চলের মানুষদের বিন্যাসটা উপস্থাপন করেছেন। এই ভিত্তিকাঠামো বেশ কিছু সময় ভালোভাবেই কাজ করেছে। পাকিস্তানি পক্ষ এবং তার সহচর হিসেবে রাজাকার দল ওই ভিত্তিকাঠামোর ভিত্তিতেই আচরণ করেছে। ইমাম, শিক্ষক, জয়নাল মিয়া ইত্যাদি। শিক্ষিত, ক্ষমতাবান, রেডিও আছে কি নেই, জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহীদের খাবার সরবরাহের ক্ষমতা আছে কি নেই ইত্যাদি হিসেব-নিকেশ কিছুক্ষণ কার্যকর থাকে। কিন্তু শীঘ্রই ভিত্তিকাঠামো ভিত্তিক এসব বর্গ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে শুরু করে।

তার জায়গা দখল করতে থাকে বর্ণবাদী আচরণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সুভাষণ, আর পরিকল্পিত সন্ত্রাস তৈরির যুদ্ধনীতি। নিজেদের ঘোষিত যুদ্ধকে সর্বাত্মক যুদ্ধ হিসেবে নিয়ে দখলদার বাহিনী অগ্রসর হয় ধর্ষণ-লুণ্ঠনে। এ স্তরেও শ্রেণি বা অন্য অনেক বর্গ অকার্যকর হয়ে যায়। আর কে না জানে, আগুন কোনো বাধ মানে না। পাকিস্তানি এবং তাদের দোসররা যে অগ্নিসংযোগে ভীষণ রকমের উৎসাহী ছিল, তার পরিচয় নীলগঞ্জবাসী ভালোভাবেই পেয়েছে।

মেজর এজাজ একজন বুদ্ধিমান মানুষ। সে নিজেও এ দাবি করেছে, আর তার কর্মকাণ্ডেও তার প্রমাণ মিলেছে। পাকিস্তানি মিলিটারির শ্রেষ্ঠত্বের মিথ, দেখা যাচ্ছে, নীলগঞ্জেও যথেষ্ট চালু ছিল। তাহলে এজাজের তো বোঝার কথা, নিপীড়ন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকৌশলের দিক থেকে তার বা তাদের জন্য বিপর্যয়কর হয়ে উঠবে। দুনিয়ার নিপীড়নের ইতিহাস সে কথাই বলে। এজাজরা যে একথা বুঝতে চায়নি, তার প্রাথমিক কারণ, একটা জনগোষ্ঠীকে অস্তিত্বের পরীক্ষায় ফেলে দেওয়া যে কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, জাতিগত ঘৃণার কারণে তারা তা অনুমান করতে পারেনি। মূল কারণ আসলে তাদের অনন্যোপায় অবস্থা। দুটি মুখোমুখি পক্ষ সামরিক কেতায় পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হলে তার আদব হয় একরকম। আর কাউকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিপক্ষ বানিয়ে লড়াই করলে তার চরিত্র হবে অন্যরকম। আগ্রাসী নিপীড়নের মুখে তখন বিপক্ষের অসামরিক-সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে বাধ্য।

ভেঙে পড়াটা সবার জন্যই বিপজ্জনক। ক্ষমতার স্বাভাবিক ক্রম ও স্তর লঙ্ঘিত হলে ওই সম্পর্কের ভিত্তিতে যে আদব ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে, তাও ভেঙে পড়তে বাধ্য। তখন বুদ্ধিমান সামরিক কর্তা এজাজের ছক বা হিসেব-নিকেশও আর কাজ করবে না। মীর আলিকে সালাম জানিয়ে দশের মন ভজানোর চেষ্টা সাময়িকভাবে কাজ করতে পারে; কৈবর্তপাড়ার চিত্রা বুড়ির ছেলের খুনের বিচারের নামে মনা কৈবর্তকে মেরে ন্যায়বিচারের একটা বিভ্রম তৈরি হতে পারে; কিংবা মনার এগার বছর বয়সী ভাইকে অকারণে হত্যার মধ্য দিয়ে কায়েম করতে পারে ভীতির রাজত্ব। কিন্তু ন্যায়বিচারের গল্প, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মিথ, বিশেষ মতাদর্শ বা ধর্মের প্রতি পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষোভের অনুমান—এসবই কাজ করেছে অস্তিত্বের ভয়ে ভীত লোকজনের মধ্যে। চূড়ান্ত পর্যায়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার প্রেক্ষাপটে অস্তিত্বের ভয় কেটে গেলে এগুলোর কোনোটাই আর কার্যকর থাকবে না।

না। তখন ন্যাংটো মাস্টার উপড় হয়ে তার পাজামা তুলতে শুরু করবে; জয়নাল মিয়া সবজান্তা গোয়েন্দার মতো তথ্য আওড়াতে থাকবে; সবদারউল্লাহ দা হাতে ঘুরে বেড়াবে অনির্দিষ্ট শত্রুর সন্ধানে; আর রফিক দৃপ্ত ভঙ্গিতে নামতে থাকবে বিলের পানিতে।

এখানে বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর কর্তাসত্তার প্রশ্নটি সামনে আসে, যে কর্তাসত্তার অভূতপূর্ব জাগরণ তাদের নিরীহ আলস্যের বিপরীত চিত্র ধরে আবির্ভূত হয়েছিল 'মুক্তি'র বেশে। প্রশ্ন হল, মেজর এজাজের বহুমাত্রিক নিপীড়নই কি অবদমিত জনতার বিপরীত মূর্তিতে আবির্ভূত হওয়ার একমাত্র কারণ? ১৯৭১-এ হুমায়ুন এ মর্মে সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়। মেজর এজাজের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে ইমাম, মাস্টার, জয়নালসহ অন্যরা যেভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তা যে এক মেধাবী নির্মাণ তা নিশ্চয় করে বলা যায়। এ মানুষগুলো আসলে ভূগোল, উৎপাদন-ব্যবস্থা, জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ইত্যাদির চেতন-অচেতন মিশেলে অতি বাস্তবের অতি সাধারণ জীবনই যাপন করছিল। ইকবাল-জিন্নাকে নিয়ে তৎপর হওয়া তার এই জীবনের জন্য জরুরি নয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ওদের সবার হয়ত বিরাগ ছিল না। কিন্তু তাই বলে জিন্নাকে বিশেষভাবে স্মরণে রাখা বা ইকবালের কবিতা চর্চা করার কথাও তাদের মনে হয়নি। ঠিক তেমনি নিজের অস্তিত্বের পক্ষে আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিব বা স্বাধীন বাংলা বেতারের তৎপরতা তাদের চাপা উল্লাসের কারণ হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। 'পাকিস্তান' নামের রাষ্ট্রটির প্রতি তখনো তাদের কারো আবেগ বা নিরপেক্ষ অবস্থান যদি থেকেও থাকে, এজাজের নিপীড়ন সে ব্যাপারে তাদের মায়া কাটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। পরিস্থিতিই অস্তিত্বের শেষ সীমানায় ফেলে দিয়ে তাদের নামিয়ে এনেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই-ই তো বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। এটাই একমাত্র ভিত্তি, যার জোরে মুক্তিযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বা 'গণযুদ্ধ' বলা যায়।

১৯৭১ উপন্যাসে লেখক তাদেরই উচ্চকিত করতে চেয়েছেন, যাদের যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বর্গেই ফেলা যায় না। আগ্রাসী বাহিনীর পক্ষেও তাদের নির্বিচারে 'শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করা আদৌ সহজ ছিল না। কিন্তু তারা তা করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ তারা রাজনৈতিক অবস্থানকে সামরিক কায়দায় মোকাবিলা করেছে। সামরিক কায়দায় মোকাবিলার পন্থা গ্রহণ করায় পুরো বাংলাদেশটাই তার ভূমি, মানুষ ও অপরাপর উপাদানসহ এক অতিকায় শত্রুপক্ষ হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষকে শত্রু-কোঠায় সক্রিয় হতে বাধ্য করে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে আসার এই প্রক্রিয়াকে হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে গভীর বিশিষ্টতা বলে সাব্যস্ত করেন। এদিক থেকে দেখলে উপন্যাসের পটভূমিকায় মীর আলিকে নিয়ে তুলনামূলক দীর্ঘ বয়ান, এবং এজাজের উল্লেখসূত্রে রেশোবা গ্রামে তার অন্ধ পিতার উল্লেখের অন্য তাৎপর্য উন্মোচিত হয়।

রেশোবা গ্রামের জনৈক অন্ধ পিতার সন্তান নীলগঞ্জের আরেক অন্ধ পিতার সন্তানের জন্য যে বিপর্যয় তৈরি করেছে, যুদ্ধের ঘটনা হিসেবে তার পরিচয় দেয়া সম্ভবপর নয়। আগেই বলা হয়েছে, এজাজের পক্ষে এ কাঠামোগত সন্ত্রাস এড়ানো কিছুতেই সম্ভব ছিল না, যেমন সম্ভব ছিল না ব্যক্তিগত জীবনসমূহের বিপর্যয় রোধ করা। ফলে, মীর আলি, যে কিনা ছেলের সম্ভাব্য মৃত্যু আর গ্রামে বিচরণশীল মিলিটারির তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে তার ভাতের ক্ষুধাকে বেশ প্রত্যক্ষ ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছিল, তার ব্যক্তিগত বিপর্যয় ঠেকানোর কোনো উপায়ই আসলে এজাজের ছিল না, যতই সে নিজের বাবার সাথে এই প্রান্তীয় মানুষটার মিল খুঁজে পাক। একটা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষের ওই বিশ্বজনীন সাযুজ্যের বোধ মুলতুবি হয়ে যায়। আর হুমায়ূন হয়তো তুলনাসূত্রেই আমদানি করেন এক কালবৈশাখির চিত্র। ১৯৭১-এ ওই কালবৈশাখি নানারকম দায়িত্ব পালন করেছে।

এজাজের সাহসিকতা ও বোধবুদ্ধির অন্যতম প্রমাণ দাখিল করা থেকে শুরু করে মুক্তিসেনাদের নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার কল্পিত বা সত্য ঘটনা ঘটতে দেয়া পর্যন্ত। একটা গুরুতর ব্যাপার এই যে, ঝড়ে মীর আলির ঘরের চালাটি উড়ে যায় মানুষ এবং অপরাপর বস্তুসামগ্রী যথাস্থানে রেখেই; আর আমাদের জানানো হয় মীর আলির ভাগ্যে আগেও একবার এ ঘটনা ঘটেছিল। সেবার পরিবারটি সামলে ওঠে দ্রুত। কিন্তু এখন, প্রাকৃতিক পীড়নের পাশাপাশি এজাজদের প্রযোজনায় অধিকতর বিপর্যয়কর যে ঘটনা ঘটছে, যেখানে তার একমাত্র জোয়ান ছেলের ঘরে ফেরার সম্ভাবনা বেশ পরিমাণে তিরোহিত, তা সামলে ওঠার কোনো আশা আর থাকে না। ঝড়-কবলিত মীর আলিকে তাই একাত্তরের অন্যায় সমরে সংঘটিত মানবিক বিপর্যয়ের প্রতীক হিসেবে পড়াই সঙ্গত। এ ধরনের অসংখ্য বহুমাত্রিক নিপীড়ন ও বিপর্যয়ের ফলে ধীরে ধীরে বদলে যায় হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে কর্মরত চৌকস তরুণ রফিক; মেজর এজাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, একটুও ভীত না হয়ে, নবলব্ধ মনোবল নিয়ে, এজাজের আশু ধ্বংসবার্তা প্রচার করে, রফিক যখন নামতে থাকে বিলের মৃত্যুর দিকে, তখনই আসলে জন্ম নিতে থাকে বদলে যাওয়া এক নতুন বাংলাদেশ।

রফিক এ উপন্যাসের সম্ভবত সবচেয়ে জটিল চরিত্র। তাকে বাস্তব হিসেবে না পড়ে প্রতীকী চরিত্র হিসেবে পড়ার নিগূঢ় আমন্ত্রণ আছে উপন্যাসটিতে। পরিষ্কার বলা হয়েছে, রফিক কখনো এ গ্রামে আসেনি। অথচ সে এমনভাবে কাজ করেছে, যেন শুধু নীলগঞ্জের রাস্তাঘাট নয়, মানুষজন এবং প্রাকৃতিক অবকাঠামোও তার খুবই চেনা। উপন্যাসের বর্ণনাধারার বাইরে গিয়ে তথ্যটি দিয়ে দিচ্ছেন স্বয়ং লেখক। সে কোন এলাকার মানুষ তা জানতে চেয়েছিল ইমাম। রফিক জবাব দেয়নি। মেজর এজাজের সহযোগী হিসেবে গ্রামে প্রবেশ করলেও 'আমরা' হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের প্রতিনিধি হয়েই সে কথা বলেছে। আর এভাবেই হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামের যে কোনো রফিক।

যুদ্ধই করতে চেয়েছে সে। তাই প্রথম থেকে নিজের অনাস্থা জানিয়ে এসেছে অন্যায্য নিপীড়নের ব্যাপারে। অবশেষে যখন সে নিশ্চিত হয়েছে, এটা যুদ্ধ নয়, অন্যায় যুদ্ধ মাত্র, তখন প্রতিবাদ ছাড়া তার হাতে আর কোনো উপায় ছিল না। প্রতিবাদটি সে করেছে জীবন দিয়ে। যুদ্ধের শুরুর পর্বে বাংলাদেশের আপামর জনতা যখন বুঝতে শুরু করে, তাদের সামষ্টিক বেঁচে থাকা কেবল ব্যক্তিক জীবনদানের মধ্য দিয়েই সম্ভবপর, তখনি আসলে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে থাকে যুদ্ধে। যুদ্ধ রূপান্তরিত হতে থাকে এক সর্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে। হুমায়ূনের সাহিত্যিকজীবনের অন্যতম মেধাবী নির্মাণ রফিক এভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ ধরনের প্রতীক হয়ে ওঠে। বিলের পানিতে সে যখন নামছিল, ততক্ষণে কৈবর্তপাড়ায় রাজাকাররা আগুন বেশ জমিয়ে তুলতে পেরেছে। আগুনের আলো পড়েছে রফিকের মুখে। আগুনের আঁচে বিলের পানিতে মেজর এজাজের কাছে অচেনা হয়ে ওঠা যে রফিক দাঁড়িয়ে আছে, সে রফিকই আসলে এ উপন্যাসের একাত্তর, এ উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১

হুমায়ুন আহমেদ

মীর আলি চোখে দেখে না।

আগে আবছা আবছা দেখত। দুপুরের রোদের দিকে তাকালে হলুদ কিছু ভাসত চোখে। গত দুবছ ধরে তাও ভাসছে না। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। তার বয়স প্রায় সত্তর। এই বয়সে চোখ-কান নষ্ট হতে শুরু করে। পৃথিবী শব্দ ও বর্ণহীন হতে থাকে। কিন্তু তার কান এখনো ভালো। বেশ ভালো। ছোট নাতনিটি যতবার কেঁদে ওঠে ততবারই সে বিরক্ত মুখে বলে, 'চুপ, শব্দ করিস না।'

মীর আলি আজকাল শব্দ সহ্য করতে পারে না। মাথার মাঝখানে কোথায় যেন ঝনঝন করে। চোখে দেখতে পেলেও বোধহয় এরকম হতো—আলো সহ্য হতো না। বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণা! সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণা রাতদুপুরে বাইরে যেতে হয়। একা একা যাওয়ার উপায় নেই। তাকে তলপেটের প্রবল চাপ নিয়ে মিহি সুরে ডাকতে হয়, 'বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!'

বদিউজ্জামান তার বড় ছেলে। মধুবন বাজারে তার একটা মনিহারী দোকান আছে। রোজ সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে সাত মাইল হেঁটে সে বাড়ি আসে। পরিশ্রমের ফলে তার ঘুম হয় গাঢ়। সে সাড়া দেয় না। মীর আলি ডেকেই চলে, 'বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!' জবাব দেয় তার ছেলের বউ অনুফা। অনুফার গলার স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণ স্বর কানে এলেই মীর আলির মাথা ধরে। তবু সে মিষ্টি সুরে বলে, 'ও বৌ, এট্টু বাইরে যাওন দরকার। বদিরে উঠাও।'

অনুফা তার স্বামীকে জাগায় না। নিজেই কুপি হাতে এগিয়ে এসে শ্বশুরের হাত ধরে। বড় লজ্জা লাগে মীর আলির। কিন্তু উপায় কী? বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণা। অনেক কষ্ট। মীর আলি নরম স্বরে বলে, 'চাঁদনি রাইত নাকি, ও বৌ?'
'জি না।'
'চউখে ফসর ফসর লাগে। মনে হয় চাঁদনি।'
'না, চাঁদনি না। এইখানে বসেন। এই নেন বদনা।'
অনুফা দূরে সরে যায়। মীর আলি ভারমুক্ত হয়। অন্যরকম একটা আনন্দ হয় তার। ইচ্ছা করে কিছুক্ষণ বসে থাকতে। অনুফা ডাকে, 'আব্বাজান, হইছে?'
'হুঁ।'
'উঠেন। বইসা আছেন কেন?'
'ফজর ওয়াক্তের দেরি কত?'
'দেরি আছে। আব্বাজান উঠেন।'
মীর আলি অনুফার সাহায্য ছাড়াই উঠানে ফিরে আসে। দক্ষিণ দিক থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। রাতের দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়েছে বোধহয়। একটা-দুটা করে শিয়াল ডাকতে শুরু করেছে।
মীর আলি হৃষ্ট গলায় বলে, 'রাইত বেশি বাকি নাই।'
অনুফা জবাব দেয় না, হাই তোলে।
'একটা জলচৌকি দেও, উঠানে বইয়া থাকি।'
'দুপুর-রাইতে উঠানে বইবেন কী? যান, ঘুমাইতে যান।'
মীর আলি বাধ্য ছেলের মতো বিছানায় শুয়ে পড়ে। একবার ঘুম ভাঙলে বাকি রাতটা তার জেগে কাটাতে হয়। সে বিছানায় বসে ঘরের স্পষ্ট-অস্পষ্ট সব শব্দ অত্যন্ত মন দিয়ে শোনে।

বদি খুকখুক করে কাশছে। টিনের চালে ঝটপট শব্দ। কীসের শব্দ? বানর? চৌকির নিচে সবগুলো হাঁস একসঙ্গে প্যাঁকপ্যাঁক করল। বাড়ির পাশে শেয়াল হাঁটাহাঁটি করছে বোধহয়। পরীবানু কেঁদে উঠল। দুধ খেতে চায়। অনুফা দুধ দেবে না। চাপা গলায় মেয়েকে শাসাচ্ছে। বদি আবার কাশছে। ঠান্ডা লেগেছে নাকি? পরশু দিন ভিজে বাড়ি ফিরেছে। জ্বর তো হবেই। বদির কথা শোনা যাচ্ছে। ফিসফিস করে কী যেন বলছে।

কী বলছে? এত ফিসফিসানি কেন ? মীর আলি কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। কাক ডাকল। সকাল হচ্ছে নাকি? মীর আলি ভোরের প্রতীক্ষা করে, তার তলপেট আবার ভারী হয়ে ওঠে।

'বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!'

'কী?'

'এট্টু বাইরে যাওন দরকার।'

বদি সাড়াশব্দ করে না। পরীবানু তারস্বরে কাঁদে। দুধ খেতে চায়।

'ও বদি, বদিউজ্জামান।'

'আসি আসি।'

'তাড়াতাড়ি কর।'

'আরে দুত্তোরি! এক রাইতে কয়বার বাইরে যাইবেন?'

বদি প্রচণ্ড একটা চড় বসায় পরীবানুর গালে। বিরক্ত গলায় বলে, 'টর্চটা দাও অনুফা।'

অনুফা টর্চ খুঁজে পায় কিন্তু অন্ধকারে ব্যাটারি খুঁজে পায় না।

মীর আলি অপেক্ষা করতে করতে একসময় অবাক হয়ে বুঝতে পারে তার প্রস্রাব হয়ে গেছে। বিছানার একটা অংশ ভেজা। সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে। এরকম তার আগে কখনো হয়নি।

'আসেন যাই। যত ঝামেলা! দেখি হাতটা বাড়ান।'

বদি তার হাত ধরে। মীর আলি খুব দুর্বল ও অসহায় বোধ করে।

'এখন থাইক্যা ঘরের মইধ্যে একটা পাতিলে পেশাব করবেন। ঝামেলা ভালো লাগে না।'

'আইচ্ছা।'

'আর পানি কম খাইবেন। বুঝলেন?'

'আইচ্ছা।'

বদি তাকে উঠোনের এক মাথায় বসিয়ে দেয়। মীর আলি প্রস্রাব করার চেষ্টা করে। প্রস্রাব হয় না, ভোঁতা একটা যন্ত্রণা হয়।

বদি হাঁক দেয়, 'কী হইছে? রাইত শেষ করবেন নাকি?'

আর ঠিক তখন মীর আলির সামনে দিয়ে সরসর শব্দ করে একটা কিছু চলে যায়। কী এটা! সাপ? মীর আলির দেখতে ইচ্ছা করে।

'আরে! বিষয় কী, ঘুমাইয়া পড়ছেন নাকি?'

'নাহ্! একটা সাপ গেল সামনে দিয়া।'

'আরে দুত্তোরি সাপ! উঠেন দেখি।'

'মনে হয় জাতি সাপ। বিরাট লম্বা মনে হইল।'

'আরে ধ্যুৎ! উইঠা আসেন।'

মীর আলি উঠে দাঁড়ায়। আর ঠিক তখন আজান হয়। মীর আলি হাসিমুখে বলে, 'আজান দিছে। ও বদি, আজান দিছে।'
'দিছে দেউখ। ঘরে চলেন।'
'ওখন আর ঘরে গিয়া কী কাম? গোসলের পানি দে। গোসল সাইরা নামাজটা পড়ি।'
বদি বিরক্ত গলায় বলে, 'অজু কইরা নামাজ পড়েন। গোসল ক্যান?'
'শইলডা পাক না। নাপাক শইল।'
'আপনে থাকেন বইয়া, অনুফারে পাঠাই। যত ঝামেলা!'
বদিউজ্জামান তার বাবাকে একটা জলচৌকির ওপর বসিয়ে ভেতরে চলে যায়। আর আসে না। পরী বানু ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদে। মীর আলি বসে থাকে চুপচাপ।

তার কিছুক্ষণ পর পঞ্চাশজন সৈন্যের ছোট একটা দল গ্রামে এসে ঢোকে। মার্চ-টার্চ না, এলোমেলোভাবে চলা। তাদের পায়ের বুটে কোনো শব্দ হয় না। তারা যায় মীর আলির বাড়ির সামনে দিয়ে এবং তাদের একজন মীর আলির চোখে পাঁচ ব্যাটারি টর্চের আলো ফেলে। মীর আলি কিছু বুঝতে পারে না। শুধু উঠোনে বসে থাকা কুকুরটা তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। মীর আলি ভীত স্বরে ডাকে, 'বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!'
কুকুরটি একসময় আর ডাকে না। দলটির পেছনে পেছনে কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। তারপর দ্রুত ফিরে আসে মীর আলির কাছে। মীর আলি উঁচু গলায় ডাকে, 'ও বদি! ও বদিউজ্জামান!'
'কী হইছে? বেহুদা চিল্লান কেন?'
'বাড়ির সামনে দিয়া কারা যেন গেল।'
'আরে দুত্তোরি! যত ফালতু ঝামেলা। চুপ কইরা বইয়া থাকেন।'

মীর আলি চুপ করে যায়। চুপ করে থাকে কুকুরটিও। নিম্নশ্রেণির প্রাণীরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। তারা টের পায়। গ্রামের নাম নীলগঞ্জ। পহেলা মে। উনিশশো একাত্তর। ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক একজন মেজর—এজাজ আহমেদ। কাকুল মিলিটারি একাডেমির একজন কৃতী ক্যাডেট। বাড়ি পেশোয়ারের এক অখ্যাত গ্রামে। তার গাঁয়ের নাম রেশোবা।

২

ময়মনসিংহ-ভৈরব লাইনের একটি স্টেশন নান্দাইল রোড।
ছোট্ট গরিব স্টেশন। মেল ট্রেন থামে না। লোকাল ট্রেন মিনিটখানেক থেকেই ফ্ল্যাগ উড়িয়ে পালিয়ে যায়। স্টেশনের বাইরে ইট-বিছানো রাস্তায় চার-পাঁচটা রিকশা ঠুন ঠুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে যাত্রী খোঁজে। সুরেলা গলা শোনা যায়, 'রুয়াইল বাজার যাওনের কেউ আছুইন। রুয়াইল বা-জা-র?'

রুয়াইল বাজার এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার। নান্দাইল রোড থেকে সোজা উত্তরে দশ মাইল। খুব খারাপ রাস্তা। বর্ষাকালে রিকশা চলে না। হেঁটে যেতে হয়। এঁটেল মাটিতে পা দেবে যায়, থিক থিক ঘন কাদা। নান্দাইল রোড থেকে রুয়াইল বাজার আসতে বেলা পুইয়ে যায়।

বাজারটি অন্য সব গ্রাম্য বাজারের মতো। তবে স্থানীয় লোকদের খুব অহংকার একে নিয়ে। কী নেই এখানে? ধানচালের আড়ত আছে। পাটের গুদাম আছে। ধান ভাঙানোর কল আছে। চায়ের দোকান আছে। এমনকি রেডিও সারাবার একজন কারিগর পর্যন্ত আছে। গ্রামের বাজারে এরচেয়ে বেশি কী দরকার?

রুয়াইল বাজারকে পেছনে ফেলে আরও মাইল ত্রিশেক উত্তরে মধুবন বাজার। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা গরুর গাড়ি। তাও শীতকালে। বর্ষায় হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। উজান দেশ। নদীনালা নেই যে নৌকা চলবে। মধুবন বাজার পেছনে ফেলে পুবদিকে সাত-আট মাইল গেলে ঘন জঙ্গল। স্থানীয় নাম মধুবনের জঙ্গলা মাঠ। কাঁটাঝোপ, বাঁশ আর জারুলের মিশ্র বন। বেশ কিছু গাব ও ডেফলজাতীয় অন্ত্যজ শ্রেণির গাছও আছে। জঙ্গলা মাঠের এক অংশ বেশ নিচু। সেখানে মোরতা গাছের ঘন অরণ্য। শীতকালে সেইসব মোরতা কেটে এনে পাটি বোনা হয়। পাকা লটকনের খোঁজে বালক-বালিকারা বনের ভেতর ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বর্ষাকালে কেউ যায় না সেদিকে। খুব সাপের উপদ্রব। বনে ঢুকে প্রতি বছরই দু-একটা গরু-ছাগল সাপের হাতে মারা পড়ে।

জঙ্গলা মাঠের পেছনে নীলগঞ্জ গ্রাম। দরিদ্র, শ্রীহীন, ত্রিশ-চল্লিশ ঘরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ। বিস্তীর্ণ জলাভূমি গ্রামটিকে কাস্তের মতো দুদিকে ঘিরে আছে। সেখানে শীতকালে প্রচুর পাখি আসে। পাখি-মারা জাল নিয়ে পাখি ধরে বাজারে বিক্রি করে পাখি-মারারা। চাষবাস যা হয় দক্ষিণের মাঠে। জমি উর্বর নয় কিংবা এরা ভালো চাষি নয়। ফসল ভালো হয় না। তবে শীতকালে এরা প্রচুর রবিশস্য করে। বর্ষার আগে-আগে করে তরমুজ ও বাঙ্গি। দক্ষিণের জমিতে কোনোরকম যত্ন ছাড়াই এ দুটি ফল প্রচুর জন্মায়। গ্রামের অধিকাংশ ঘরেই খড়ের ছাউনি। সম্প্রতি কয়েকটি টিনের ঘর হয়েছে। বদিউজ্জামানের ঘরটি টিনের। তার হাতে এখন কিছু পয়সাকড়ি হয়েছে। টিনের ঘর বানানো ছাড়াও সে একটা সাইকেল কিনেছে। চালানো শিখে উঠেনি বলে এখনো সে হেঁটেই মধুবন বাজারে যায়। সপ্তাহে একবার নতুন সাইকেলটি ঝাড়পোঁছ করে। গ্রামের একমাত্র পাকা দালানটি প্রকাণ্ড। দুবিঘা জমির ওপর একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার নায়েব চন্দ্রকান্ত সেন মশাই এ বাড়ি বানিয়ে গৃহপ্রবেশের দিন সর্পাঘাতে মারা পড়েন।

চন্দ্রকান্ত সেন প্রচুর ধনসম্পদ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেসবের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। সবার ধারণা, সোনাদানা পিতলের কলসিতে ভরে তিনি যখ করে গেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা পিতলের কলসির খোঁজে প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। চন্দ্রকান্ত সেন মশাইয়ের বর্তমান একমাত্র উত্তরাধিকারী নীলু সেন প্রকাণ্ড দালানটিতে থাকেন। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। দেখায় তার চেয়েও বেশি। নীলু সেনকে গ্রামে যথেষ্ট খাতির করা হয়। যাবতীয় সালিশিতে তিনি থাকেন। বিয়েশাদির কোনো কথাবার্তা তাঁকে ছাড়া কখনো হয় না। লোকটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী। এ গ্রামে সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি হচ্ছে জয়নাল মিয়া। প্রচুর বিষয়সম্পত্তির মালিক। মধুবন বাজারে তার দুটি ঘরও আছে। লোকটি মেরুদণ্ডহীন। সবার মন রেখে কথা বলার চেষ্টা করে। গ্রাম্য সালিশিতে সবার কথাই সমর্থন করে বিচার-সমস্যা জটিল করে তোলে। তবু সবাই তাকে মোটামুটি সহ্য করে। সম্পদশালীরা এই সুবিধাটি সব জায়গাতেই ভোগ করে।

দুজন বিদেশি লোক আছেন নীলগঞ্জে। একজন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব। এত জায়গা থাকতে তিনি এই দুর্গম অঞ্চলে ইমামতি করতে কেন এসেছেন সে রহস্যের মীমাংসা হয়নি। তিনি মসজিদেই থাকেন। মাসের পনেরো দিন জয়নাল মিয়ার বাড়িতে খান। বাকি পনেরো দিন পালা করে অন্য ঘরগুলোতে খান। কিছুদিন হলো তিনি বিয়ে করে এই গ্রামে স্থায়ীভাবে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

প্রস্তাবটিতে কেউ এখনো তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। ধানি জমি দিতে পারে জয়নাল মিয়া। সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে। শুনেও না-শোনার ভান করছে। দ্বিতীয় বিদেশি লোকটি হচ্ছে আজিজ মাস্টার। সে নীলগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। প্রাইমারি স্কুল সরকারি সাহায্যে তিন বছর আগে শুরু হয়। উদ্দেশ্য বোধহয় একটিই–দুর্গম অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌছানো। উদ্দেশ্য সফল হয়নি। শিক্ষকরা কেউ বেশিদিন থাকতে পারে না।

খাতাপত্রে তিনজন শিক্ষক থাকার কথা। এখন আছে একজন—আজিজ মাস্টার। লোকটি রুগ্‌ণ, নানান রকম অসুখ-বিসুখ। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে হাঁপানি। শীতকালে এর প্রকোপ হয়। গরমকালটা মোটামুটি ভালোই কেটে যায়। আজিজ মাস্টার একজন কবি। সে গত তিন মাসে চার নম্বরি একটি রুলটানা খাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি কবিতা একটি রমণীকে উদ্দেশ্য করে লেখা, যাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে, যেমন—স্বপ্ন-রানী, কেশবতী, অচিন পাখি ইত্যাদি। তার তিনটি কবিতা নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক কিষাণ পত্রিকা'য় ছাপা হয়েছে। আজিজ মাস্টারের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে গ্রামের লোকজন ওয়াকিবহাল। তারা এই কবিকে যথেষ্ট সমীহ করে। সমীহ করার আরেকটি কারণ হলো, আজিজ মাস্টার গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। বিএ পর্যন্ত পড়েছিল। পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তার আবার পরীক্ষা দেওয়ার কথা।

সে জয়নাল মিয়ার একটি ঘরে থাকে। তার স্ত্রীকে সে 'ভাবিসাব' ডাকে কিন্তু তার বড় মেয়েটিকে দেখলেই কেমন যেন বিচলিত বোধ করে। মেয়েটির নাম মালা। মাঝে মাঝে মালা তাকে ভাত বেড়ে দেয়। সে-সময়টা আজিজ মাস্টার বড় অস্বস্তি বোধ করে। সে যখন বলে, 'মামা, আরেকটু ভাত দেই?' তখন কোনো কারণ ছাড়াই আজিজ মাস্টারের কান-টান লাল হয়ে যায়। আজিজ মাস্টার কয়েকদিন আগে 'মালা রানী' নামের একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছে। কবিতাটি 'কিষাণ' পত্রিকায় পাঠাবে কি না এ নিয়ে সে খুব চিন্তিত। হয়তো পাঠাবে। নীলগঞ্জের যে দিকটায় জলাভূমি, একদল কৈবর্ত থাকে সেদিকে। গ্রামের সঙ্গে তাদের খুব একটা যোগ নেই। মাছ ধরার সিজনে জলমহালে মাছ মারতে যায়। আবার ফিরে আসে। কর্মহীন সময়টাতে চুরি-ডাকাতি করে। নীলগঞ্জের কেউ এদের ঘাঁটায় না।

গত বৎসর কৈবর্তপাড়ায় খুন হলো একটা। নীলগঞ্জের মাতবররা এমন ভাব করলেন যেন তাঁরা কিছুই জানেন না। থানা-পুলিশ কিছুই হলো না। যার ছেলে খুন হলো সেই চিত্রা বুড়ি কিছুদিন ছোটাছুটি করল নীলু সেনের কাছে। নীলু সেন শুকনো গলায় বললেন, 'তোদের ঝামেলা তোরা মিটা। থানাওয়ালার কাছে যা।' বুড়ি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'থানাওয়ালার কাছে গেলে আমারে দহের মইধ্যে পুইত্তা থুইব কইছে।' নীলু সেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। টেনে টেনে বললেন, 'এদের ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না। রক্তগরম জাত। কী করতে কী করে।'
'বিচার অইত না?'
নীলু সেন তার জবাব দিতে পারলেন না। অস্পষ্টভাবে বললেন, 'এখন বাদ দে। পরে দেখি কিছু করা যায় কি না।' বুড়ি আরও কিছুদিন ছোটাছুটি করল। এবং একদিন দেখা গেল কৈবর্তরা দলবেঁধে জলমহালে মাছ মারতে গিয়েছে। বুড়িকে সঙ্গে নেয়নি। বুড়ি আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করল কিছুদিন। নীলু সেনের দালানের একপ্রান্তে থাকতে লাগল। চরম দুর্দিন। কৈবর্তরা ফিরে এলো তিনমাস পর, কিন্তু বুড়ির জায়গা হলো না। সে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ভিক্ষা করে খেতে লাগল। হতদরিদ্র নীলগঞ্জের প্রথম ভিক্ষুক।

সব গ্রামের মতো এই গ্রামে একজন পাগলও আছে। মতি মিয়ার শালা নিজাম। সে বেশির ভাগ সময়ই সুস্থ থাকে। শুধু দু-একদিন মাথা গরম হয়ে যায়। তখন তার গায়ে কোনো কাপড় থাকে না। গ্রামের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে থাকে। দুপুরের রোদ খুব বেড়ে গেলে মধুবন জঙ্গলায় ঢুকে পড়ে। 'পাগলদের সাপে কাটে না' প্রবাদটি হয়তো সত্যি। নিজাম বহাল তবিয়তেই বন থেকে বেরিয়ে আসে। ছোটাছুটি করা এবং বনের ভেতরে বসে থাকা ছাড়া সে অন্য কোনো উপদ্রব করে না। গ্রামের পাগলদের গ্রামবাসীরা খুব স্নেহের চোখে দেখে। তাদের প্রতি অন্য একধরনের মমতা থাকে সবার।

৩

চিত্রা বুড়ি রাতে একনাগাড়ে কখনো ঘুমায় না।

ক্ষণে-ক্ষণে জেগে উঠে চেঁচায়, 'কেলা যায় গো? লোকটা কে?'
তার ঘুমোবার জায়গাটা হচ্ছে সেনবাড়ির পাকা কালীমন্দিরের চাতাল। নীলু সেন তাকে থাকবার জন্য একটা ঘর দিয়েছিলেন। সেখানে নাকি তার ঘুম হয় না। দেবীমূর্তির পাশে সে বোধহয় একধরনের নিরাপত্তা বোধ করে। গভীর রাতে দেবীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হয়, যেমন–'দেখিস হেই মা কালী, আমার পুতরে যে মারছে তুই তার কইলজাটা টাইন্যা খা। তরে আমি জোড়া পাঁঠা দিমু। বুক চিইরা রক্ত দিমু–হেই মা কালী, দেখিস রে বেটি, দেখিস।'

মা কালী কিছু শোনেন কি না বলা মুশকিল। কিন্তু চিত্রা বুড়ির ধারণা, তিনি শোনেন এবং তিনি যে শুনছেন তার নমুনাও দেন। যেমন–এক রাত্রিতে খলখল হাসির শব্দ শোনা গেল। বুড়ির রক্ত জল হয়ে যাবার মতো অবস্থা। সে কাঁপা গলায় ডাকল, 'হেই মা।' হাসির শব্দ দ্বিতীয়বার আর শোনা গেল না। দেবীরা তাঁদের মহিমা বারবার করে দেখাতে ভালোবাসেন না।

চিত্রা বুড়ি আজ রাতেও মা কালীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের অনেক কথা বলল। জোড়া পাঁঠার আশ্বাস দিয়ে ঘুমাতে গেল। তারপর জেগে উঠে চেঁচাল, 'কেলা যায় গো? লোকটা কে?' কেউ জবাব দিলো না, কিন্তু বুড়ির মনে হলো অনেকগুলো মানুষ যেন এদিকে আসছে। শব্দ করে পা ফেলছে। হুঁ হাঁ হুঁ হাঁ এরকম একটা আওয়াজও আসছে। ডাকাত নাকি? চিত্রা বুড়ি ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। তার চোখের সামনে দিয়ে মিলিটারি দলটি পার হলো। আলো কম। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না।

চিত্রা বুড়ি কিছু বুঝতে পারল না। এরা কারা? এই রাতে কোত্থেকে এসেছে? বুড়ি দেখল, সেনবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার টর্চের আলো ফেলল। এর মানে কি ডাকাত? কিন্তু সেনবাড়িতে ডাকাত আসার কথা নয়। সেনরা এখন হতদরিদ্র। এই বিশাল বাড়ির ইটগুলো ছাড়া ওদের আর কিছুই নেই।

ওরা আবার চলতে শুরু করেছে। জুম্মাঘরের কাছে এসে আবার সেনবাড়ির ওপর টর্চের আলো ফেলল। কোনদিকে যাচ্ছে? কৈবর্তপাড়ার দিকে? ওদের আগেভাগে খবর দেওয়া দরকার। সেনবাড়ির পেছন দিক দিয়ে ছুটে গিয়ে খবর দেবে? চিত্রা বুড়ির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগছে। এই রাতের বেলা দলবেঁধে এরা কেন আসবে?

না, কৈবর্তপাড়ার দিকে যাচ্ছে না। জুম্মাঘর পেছনে ফেলে এরা সড়কে উঠে গেল। টর্চের আলো এখন আর ফেলছে না। বুড়ির মনে হলো এরা স্কুলঘরের দিকে যাচ্ছে। আজিজ মাস্টারকে খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু তারও আগে খবর দেওয়া দরকার কৈবর্ত পাড়ায়। বিপদের সময় নিজ গোত্রের মানুষের কথাই প্রথম মনে পড়ে।

চার-পাঁচটা কুকুর একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে। এরা কিছু টের পেয়েছে। কুকুর-বেড়াল অনেক কিছু আগেভাগে জানে। বুড়ি কালীমন্দিরের চাতাল থেকে নেমে এলো। সে কোনদিকে যাবে মনস্থির করতে পারছে না।

গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে এটা প্রথম বুঝতে পারলেন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব। পাকা মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি সুরা ইয়াসিন পড়ছিলেন। আজান দেবার আগে তিনি তিনবার সুরা ইয়াসিন পড়েন। দ্বিতীয়বার পড়বার সময় অবাক হয়ে পুরো দলটাকে দেখলেন। এরা স্কুলঘরের দিকে যাচ্ছে।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত তিনি ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না। সুরা ইয়াসিন শেষ করে দীর্ঘ সময় মসজিদের সিঁড়িতে বসে রইলেন। অন্ধকার এখনো কাটেনি। পাখপাখালি ডাকছে। ইমাম সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না–এখানে বসে থাকবেন, না খবর দেওয়ার জন্য ছুটে যাবেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে হলো, সিঁড়িতে এরকম প্রকাশ্যে বসে থাকা ঠিক না। মসজিদের ভেতরে থাকা দরকার। কিন্তু নীলগঞ্জ মসজিদে তিনি কখনো একা ঢোকেন না। এই মসজিদে জিন নামাজ পড়ে – এরকম একটা প্রবাদ আছে। অনেকেই দেখেছে। তিনি অবশ্য এখনো দেখেননি। কিন্তু তাঁর ভয় করে।

একা বসে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো, এই যে তিনি দেখলেন একদল মিলিটারি, এটা চোখের ভুল না তো? নান্দাইল রোডে মিলিটারি আসেনি, সোহাগীতে আসেনি–এখানে আসবে কেন? এখানে আছেটা কী? নেহায়েতই গণ্ডগ্রাম।

ইমাম সাহেব ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। স্কুলঘর বাঁশবনের আড়ালে পড়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মুসল্লিরা কেউ আসছে না কেন? নাকি মিলিটারির খবর জেনে গেছে সবাই? তাঁর প্রবল ইচ্ছে হতে লাগল নামাজ না–পড়েই ঘরে ফিরে যেতে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে অথচ কারও দেখা নেই।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবার পর মতি মিয়াকে আসতে দেখা গেল। মতি মিয়া একটা মামলায় জড়িয়ে ইদানীং ধর্মকর্মে অতিরিক্ত রকমের উৎসাহী হয়ে পড়েছে। ইমাম সাহেব নিচুগলায় বললেন, 'এই মতি, কিছু দেখলা?'

'কী দেখমু ? কিসের কথা কন?'

'কিছু দেখ নাই?'

'না। বিষয়ডা কী ?'

ইমাম সাহেব আর কিছু না বলে চিন্তিত ভঙ্গিতে আজান দিতে গেলেন। আজান শেষ করে মতি মিয়াকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ইস্কুলঘরের কাছে কিছুই দেখ নাই?'

'নাহ্। ব্যাপারডা কী ভাইঙ্গা কন।'

'মনে হয় গেরামে মিলিটারি ঢুকছে।'

'কী ঢুকছে ?'

'মিলিটারি।'

'আরে কী কন? এই গেরামে মিলিটারি আইব ক্যান?'

'আমি যাইতে দেখলাম।'

'চউক্ষের ধান্ধা। আন্ধাইরে কী দেখতে কী দেখছেন। নান্দাইল রোডে তো এখন তক মিলিটারি আসে নাই।'

'তুমি জানলা ক্যামনে?'

'আমার শালা আইছে গতকাইল। নেজামের বড় ভাই।'

'আমি কিন্তু নিজের চউক্ষে দেখলাম।'

'আরে না। মিলিটারি আইলে এতক্ষণে গুলি শুরু হইয়া যাইত। মিলিটারি কি সোজা জিনিস?'

ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করবার আগেই আরও তিনজন নামাজি এসে পড়ল। তারাও কিছু জানে না। একজন এসেছে স্কুলঘরের সামনে দিয়ে, সেও কিছু দেখেনি।

ইমাম সাহেব আজ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়লেন। নামাজের শেষে সাধারণত তিনি হাদিস-কোরআনের দুই-একটি কথা বলেন। আজ কিছুই বললেন না। বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বেশ আলো চারদিকে। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

জোড়া শিমুলগাছের কাছে এসে তিনি আড়চোখে স্কুলঘরের দিকে তাকালেন। বারান্দায় সারি সারি সৈন্য বসে আছে। ইমাম সাহেবের মনে হলো, স্কুল কম্পাউন্ডের গেটের কাছে দাঁড়ানো একটা লোক হাত ইশারা করে তাঁকে ডাকছে। লোকটির পরনে ফুল প্যান্ট এবং নীল রঙের একটা হাফ শার্ট। কিন্তু তাঁকে ডাকছে কেন? নাকি তিনি ভুল দেখছেন? ইমাম সাহেবের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। তিনি একবার আয়াতুল কুরসি ও তিনবার দোয়া ইউনুস পড়ে স্কুলঘরের দিকে এগুলেন।

নীল শার্ট পরা লোকটিও এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। ব্যাপার কী? এ কে? তিনি অতি দ্রুত দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন–'লাইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জুয়ালিমিন।' এই দোয়াটি খুব কাজের। হযরত ইউনুস আলায়হেস সালাম মাছের পেটে বসে এই দোয়া পড়েছিলেন।

'নীল শার্ট পরা লোকটা এগিয়ে আসছে। কী চায় সে?'
'আপনি কে?'
'আমি এই গেরামের ইমাম।'
'আচ্ছালামু আলায়কুম, ইমাম সাহেব।'
'ওয়ালাইকুম সালাম ওয়ারাহমতুলাহ।'
'আপনি একটু আসেন আমার সাথে।'
'কই যাইতাম?'
'আসেন। মেজর সাব আপনাকে ডাকেন। ভয়ের কিছু নাই, আসেন।'
ইমাম সাহেব তিনবার ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা আগে ফেললেন। সঙ্গের নীল শার্ট পরা লোকটি মৃদুস্বরে বলল, 'এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ভয়ের কিছুই নাই।'

৪

আজিজ মাস্টারের অনিদ্রা রোগ আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত তাকে জেগে থাকতে হয় বলেই অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাতে হয়। আজ তাকে ভোরের আলো ফোটার আগেই জাগতে হলো। কারণ স্কুলের দপ্তরি ও দারোয়ান রাসমোহন প্রচণ্ড শব্দে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, এক্ষুনি আজিজ মাস্টারকে ঘর থেকে বের করতে হবে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আজিজ মাস্টার কথা বলল,
'এই রাসমোহন, কী ব্যাপার?'
'মিলিটারি। গেরামে মিলিটারি আসছে। ইস্কুলঘরে।'
'কী বলছিস রাসমোহন?'
'আপনারে স্যার ডাকে।'

আজিজ মাস্টার দরজা খুলে দেখল, রাসমোহনের থুতনি বেয়ে ঘাম পড়ছে। গায়ের ফতুয়াটাও ঘামে ভেজা। স্কুল থেকে দৌড়ে এসেছে বোধহয়। শব্দ করে শ্বাস টানছে। রাসমোহন আবার বলল, 'মিলিটারি আপনারে ডাকে স্যার।' আজিজ মাস্টার রাসমোহনের কথা মোটেও বিশ্বাস করল না। সময়টা খারাপ। খাকি পোশাকের একজন পিয়ন দেখলেও সবাই ভাবে পাঞ্জাবি মিলিটারি। রাসমোহনের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে। থানাওয়ালারা কেউ এসেছে কেন্দুয়া থেকে। খুব সম্ভব চিত্রা বুড়ির ছেলের ব্যাপারে। মার্ডার কেইসে পুলিশের খুব উৎসাহ। দলবেঁধে চলে আসে। নগদ বিদায়ের ব্যবস্থা আছে।

এখানেও তাই হয়েছে। আজিজ মাস্টার অনেকখানি সময় নিয়ে হাত-মুখ ধুল। তার মাথায় চুল নেই, তবু যত্ন করে চুল আঁচড়াল। পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরুল। অর্ধেক পথ আসার পর তার মনে পড়ল চাবি ফেলে এসেছে। আবার ফিরে গেল চাবি আনতে। বাড়ি ফিরবার পথে সত্যি সত্যি বুঝল গ্রামে মিলিটারি এসেছে। মতি মিয়ার সঙ্গে তার দেখা হলো। রতন মাঝির সঙ্গে দেখা হলো। বাড়ি ঢুকবার মুখে জয়নাল মিয়াকেও ছাতা মাথায় দিয়ে আসতে দেখা গেল। রাসমোহন এদের প্রত্যেককে একবার একবার করে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল।

রাসমোহনের বর্ণনামতে, সে স্কুলঘরের বারান্দায় ঘুমাচ্ছিল। তখনো চারদিকে অন্ধকার। কে যেন তার পায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখে টর্চের আলো ফেলল। সে উঠে বসে দেখে স্কুলে মিলিটারি গিজগিজ করছে।

জয়নাল মিয়া নিচুগলায় বলল, 'আন্দাজ কতজন হইব?' 'চাইর-পাঁচশ'র কম না।'

'কও কী তুমি?'

'বেশিও হইতে পারে। সবটি মস্ত জোয়ান।'

'জোয়ান তো হইবোই। মিলিটারি দুবলা-পাতলা হয় নাকি?'

'হাতে অস্ত্রপাতি আছে?'

জয়নাল মিয়া বিরক্ত মুখে বলল, 'অস্ত্রপাতি তো থাকবোই। এরা কি বিয়া করতে আইছে?'

আজিজ মাস্টার গম্ভীর গলায় বলল, 'তারপর কী হয়েছে রাসমোহন?'

'তারা আমার নাম জিগাইল।'

আজিজ মাস্টার বলল, 'কোন ভাষায়, উর্দু না ইংরেজি?'

'বাংলায়। পরিষ্কার জিগাইল–তোমার নাম কী? তুমি কে? কী করো?'

'তা কীভাবে হয়? এরা তো বাংলা জানে না।'

'আমি স্যার পরিষ্কার হুনলাম। নিজের কানে হুনলাম।'

'তারপর বলো। তারপর কী হলো?'

'আমি কইলাম, আমার নাম রাসমোহন। আমি স্কুলের দপ্তরি। তখন তারা কইল, হেডমাস্টাররে ডাইক্যা আনো।'

'বাংলায় বলল?'

'জি স্যার।'

'আরে কী যে বলে পাগল-ছাগলের মতো! এরা বাংলা জানে নাকি? কী শুনতে কী শুনেছ?'

আজিজ একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে লক্ষ করল তার হাত কাঁপছে। এবং প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। এক্ষুনি হাঁপানির টান শুরু হবে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তার হাঁপানির টান ওঠে। এখন সিগারেট খাওয়াটা ঠিক হবে না জেনেও আজিজ মাস্টার লম্বা লম্বা টান দিতে শুরু করল। সে সাধারণত জয়নাল মিয়ার সামনে সিগারেট খায় না। জয়নাল মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি যাও মাস্টার, বিষয়ডা কী জাইন্যা আস।'

'আমি, আমি কী জন্যে যাব?'

'আরে, ডাকতাছে তোমারে। তুমি যাইবা না তো যাইবোটা কে?'

আজিজ মাস্টারের সত্যি সত্যি হাঁপানির টান উঠে গেল। সিগারেট ফেলে দিয়ে সে লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে শুরু করল। জয়নাল মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, 'এরা এইখানে থাকবার জন্যে আসে নাই। বুঝলা? যাইতাছে অন্য কোনোখানে। ভয়ের কিছু নাই। একটা পাকিস্তানি পতাকা হাতে নিয়া যাও। একটা পতাকা আছে না? বাঁশের আগায় বান্ধ।'

'আমি একলা যাব? বলেন কী?'
'একসঙ্গে বেশি মানুষ যাওয়া ঠিক না।'
'ঠিক-বেঠিক যাই হোক, আমি একা যাব না।'
'এই রকম করতাছ কেন মাস্টার, এরা বাঘও না,– ভাল্লুকও না?'
'একা যাব না। আপনারা চলেন আমার সাথে।'

সকাল প্রায় সাতটার দিকে ছজনের একটি ছোট্ট দলকে একটি পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে ইস্কুলঘরের দিকে আগাতে দেখা গেল। রোগা আজিজ মাস্টার দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছে। সে ইস্কুলঘরের কাছাকাছি এসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'পাকিস্তান!' দলের অন্য সবাই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বলল, 'জিন্দাবাদ!'
'কায়দে আযম!'
'জিন্দাবাদ!'
'লিয়াকত আলী খান!'
'জিন্দাবাদ!'
'মহাকবি ইকবাল!'
'জিন্দাবাদ!'

৫

রোদ উঠে গেছে।
বৈশাখ মাস–অল্প সময়েই রোদ ঝাঁজালো হয়ে ওঠে।

ছোট্ট দলটি, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে আজিজ মাস্টার, রোদে দাঁড়িয়ে ঘামছে। তাদের মুখ রক্তশূন্য। তারা বুকের মাঝে একধরনের কাঁপুনি অনুভব করছে।
রাস্তার ওপাশে চার-পাঁচটা জারুল গাছ। গাছের নিচে গেলে ছায়া পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া ঠিক হবে কি না আজিজ মাস্টার বুঝতে পারছে না। তারা জড়াজড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধ্বনি দেয়। আড়চোখে মিলিটারিদের দিকে তাকায়। সরাসরি তাকাতে সাহসে কুলায় না। সমস্ত বারান্দাজুড়ে মিলিটারিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেউ বসে আছে। কেউ মাথার নিচে হ্যাভারস্যাক দিয়ে ঘুমের মতো পড়ে আছে। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে আসা দলটির প্রতি তাদের কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। তাদের দৃষ্টি সন্ন্যাসীদের মতো নির্লিপ্ত। যেন জগতের কোনো কিছুতেই তাদের কিছু আসে-যায় না।
পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটি মতি মিয়ার হাতে। সে হাত উঁচু করে ফ্ল্যাগটি দোলাচ্ছিল। হাত ব্যথা হয়ে গেছে, কিন্তু নামাবার সাহস হচ্ছে না। আজিজ মাস্টার খুকখুক করে কয়েকবার কাশল। সেই শব্দে বারান্দায় বসা কয়েকজন তাকাল তার দিকে। আজিজ মাস্টার প্রাণপণে কাশি চাপতে চেষ্টা করল। সময়টা খারাপ। এরকম সময়ে কাউকে অযথা বিরক্ত করা ঠিক না। কিন্তু ক্রমাগত কাশি উঠছে। আজিজ মাস্টার লক্ষ করল, উঠোনে চেয়ার পেতে যে অফিসারটি বসে আছেন তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।
অত্যন্ত রূপবান একজন মানুষ। মিলিটারি পোশাকেও তাকে রাজপুত্রের মতো লাগছে। এর চোখে-মুখে কোনো ক্লান্তি নেই। তবে বসে থাকার ভঙ্গিটি শ্রান্তির ভঙ্গি। তিনি তার সামনের টেবিলে পা তুলে দিয়েছেন। পায়ে খয়েরি রঙের মোজা। মানুষটি প্রকাণ্ড, তবে সেই তুলনায় পায়ের পাতা দুটি ছোট।

তার কাছাকাছি যে রোগা লোকটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখতে বাঙালির মতো লাগছে। তার গায়ে চকচকে নীল রঙের একটা শার্ট। এই লোকটি খুব ঘামছে। ময়লা একটা রুমালে ক্রমাগত ঘাড় মুছছে। অফিসারটি মৃদুস্বরে কী যেন বলল নীল শার্ট পরা লোকটিকে। নীল শার্ট পরা লোকটি তীক্ষ্ণগলায় বলল, 'আপনাদের মধ্যে হেডমাস্টার সাহেব কে?'

আজিজ মাস্টারের বুকের মধ্যে শিরশির করতে লাগল।

'কে আপনাদের মধ্যে হেডমাস্টার?'

মতি মিয়া আজিজ মাস্টারের পিঠে মৃদু ধাক্কা দিলো। আজিজ মাস্টার কাশির বেগ থামাতে থামাতে বলল, 'জ্বি আমি।'

'আপনি থাকেন। অন্য সবাইকে যেতে বলেন। যান ভাই, আপনারা সবাই যান। ভয়ের কিছুই নাই।'

আজিজ মাস্টার একা দাঁড়িয়ে রইল। অন্যরা মনে হলো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। তবে তারা চলেও গেল না। জুম্মাঘরের কাছে ছাতিম গাছের নিচে বসে রইল চুপচাপ। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাস্টার ফিরে না-আসা পর্যন্ত কিছু পরিষ্কার হবে না।

মতি বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল। সে জয়নাল মিয়ার সামনে বিড়ি খায় না। এই কথা তার মনে রইল না। সময়টা খারাপ। এই সময় কোনো কিছু মনে থাকে না। ছোট চৌধুরীও সিগারেট ধরালেন। তিনি সকাল থেকেই ঘামছেন।

মতি মিয়া বলল, 'ভয়ের কিছু নাই, কী কন?'

'নাহ, ভয়ের কী? এরা বাঘও না ভাল্লুকও না।'

'একেবারে খাঁটি কথা।'

'অন্যায় তো কিছু করি নাই। অন্যায় করলে একটা কথা আছিল।'

'একেবারে খাঁটি কথা। অতি লেহ্য কথা।'

জয়নাল মিয়া উৎসাহিত বোধ করে। মতি বলল, 'নীলু চাচার বাড়িত যাই, চলেন।' কথাটা তার খুব মনে ধরে। কিন্তু আজিজ মাস্টার ফিরে না আসা পর্যন্ত নড়তেও ইচ্ছে করে না। রোদ চড়তে শুরু করে। ছাতিম গাছের নিচে একটি-দু-টি করে মানুষ জমতে শুরু করে। সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ।

উত্তর বন্দে বোরো ধান পেকে আছে। কাটতে হবে। কিছু কিছু জমিতে পাট দেওয়া হয়েছে। খেত নিড়ানির সময় এখন। দক্ষিণ বন্দে আউশ বোনা হবে। কিন্তু আজ মনে হয় এ গ্রামের কেউ কোথাও যাবে না। আজকের দিনটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে সবাই অপেক্ষা করবে। এ গ্রামে বহুদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি।

বদিকে দেখা গেল ফর্সা জামা গায়ে দিয়ে হনহন করে আসছে। তার বগলে ছাতা। ছাতিম গাছের নিচে একসঙ্গে এতগুলো মানুষ দেখে হকচকিয়ে গেল।

'বিষয় কী?'

মতি মিয়া ঠান্ডা গলায় বলল, 'জানো না কিছু?'

'কী জানুম ?'

'আরে মুসিবত! জান লইয়া টানাটানি, আর কিছুই জানো না ?'

বদি চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকায়। কিছু বুঝতে পারে না। জয়নাল মিয়া ঠান্ডা গলায় বলে, 'গেরামে মিলিটারি আইছে।'

'এইটা কী কন? এইখানে মিলিটারি আইব ক্যান?'

'স্কুলঘরে গিয়া নিজের চউক্ষে দেখ। আজিজ মাস্টাররে রাইখ্যা দিছে।'

'অ্যাঁ।'
'আজ মধুবনে গিয়া কাম নাই, বাড়িত যাও।'
বদি রাস্তার ওপর বসে পড়ে। ফিসফিস করে বলে, 'কী সর্বনাশ!'
জয়নাল মিয়া বিরক্ত হয়ে বলে, 'সর্বনাশের কী আছে? আমরা কী করলাম? কিছু করছি আমরা?'
বদি মুখ লম্বা করে বসে থাকে। একসময় মৃদুস্বরে বলে, 'মুসলমানের জন্যে ভয়ের কিছু নাই। এরা মুসলমানদের খুব খাতির করে। তবে পাক্কা মুসলমান হওয়া লাগে। চাইর কলমা জিজ্ঞেস করে।'
সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। চার কলমা কারও জানা নেই। বদি উৎসাহিত হয়ে বলে, 'সুন্নত হইছে কি না এটাও দেখে। কাপড় খুইলা দেখে।'
'তুমি জানলা ক্যামনে?'
'নান্দাইল রোডে হুনছি। সুন্নত না থাকলেই দুম। গুল্লি।'
'কও কী তুমি?'
'মিলিটারি মানুষ। রাগ বেশি। আমরার মতো না। রাগ উঠলেই দুম।'

বদি একটি বিড়ি ধরিয়ে দ্রুত টানতে থাকে। তার মধুবনে যাওয়া অত্যন্ত দরকার। কে জানে হয়তো মধুবনেও মিলিটারি এসে দোকানপাট জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে উঠে দাঁড়াল। মতি মিয়া বলল, 'যাও কই?' বদি তার উত্তর না দিয়ে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করল। ইস্কুলঘরকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। হাঁটতে হবে অনেক পথ।

কড়া রোদ উঠেছে। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। বদি হনহন করে ছুটছে।

৬

রোগা নীল শার্ট পরা লোকটি বাঙালি।

সে আজিজ মাস্টারের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'ইনি মেজর এজাজ আহমেদ, ইনারে সালাম দেন।' আজিজ মাস্টার যন্ত্রের মতো বলল, 'স্লামালিকুম।' মেজর এজাজ পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আপনার নাম কী?'
জি, আমার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক।'
'সে ইট অ্যাগেইন।'
আজিজ মাস্টার নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে তাকাল। সে ঠান্ডা গলায় বলল, 'নামটা আরেক বার বলেন। স্পষ্ট করে বলেন। গলায় জোর নাই?'
আজিজ মাস্টার বলল, 'আজিজুর রহমান মল্লিক।'
'আপনি বসুন।'

কোথায় বসতে বলছে? বসার দ্বিতীয় কোনো চেয়ার নেই। মাটিতে বসতে বলছে নাকি? আজিজ মাস্টারের গলা শুকিয়ে গেল। রোগা লোকটি স্কুলঘর থেকে একটি চেয়ার নিয়ে এলো। ঠান্ডা গলায় বলল, 'বসেন। স্যার বসতে বলেছেন, বসেন।' আজিজ মাস্টার সংকুচিত ভঙ্গিতে বসল। মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বললেন না। সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। আজিজ মাস্টার কাঁপা গলায় বলল, 'স্যার, ভালো আছেন?' রোগা লোকটি বলল, 'শুনেন ভাই, আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবেন না। যা জিজ্ঞেস করবে শুধু তার জবাব দিবেন। ইনি লোক ভালো, ভয়ের কিছুই নাই। স্যার বাংলা বলতে পারেন না, কিন্তু ভালো বোঝেন।'

'জি আচ্ছা।'

'আপনার ভয়ের কিছু নাই। আরাম করে বসেন।'

আজিজ মাস্টার আরাম করে বসার একটা ভঙ্গি করল। মেজর সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। প্যাকেটটি বাড়িয়ে দিলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। আজিজ মাস্টার ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। রোগা লোকটি বলল, 'স্যার দিচ্ছেন যখন, নেন। বললাম না ইনি লোক ভালো।' আজিজ মাস্টার একটা সিগারেট নিল। কী আশ্চর্য! মেজর সাহেব নিজে সিগারেটটি ধরিয়ে দিলেন। আজিজ মাস্টার তার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেল।

পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো। মেজর সাহেব প্রশ্ন করলেন ইংরেজিতে, আজিজ মাস্টার জবাব দিল বাংলায়। কিছু প্রশ্ন আজিজ মাস্টার বুঝতে পারল না। নীল শার্ট পরা লোকটি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলো।

'তোমার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক?'

'জি স্যার।'

'মল্লিক মানে কী ?'

'জানি না স্যার!'

'এই গ্রামে কতজন মানুষ ?'

'জানি না স্যার।'

'কতজন হিন্দু আছে?'

'জানি না স্যার।'

'তুমি দেখি কিছুই জানো না।'

'স্যার, আমি বিদেশি মানুষ।'

'বিদেশি মানুষ মানে? তুমি পাকিস্তানি না?'

'জি স্যার।'

'তাহলে তুমি বিদেশি হলে কীভাবে?'

মেজর সাহেব চোখ বন্ধ করে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। আজিজ মাস্টারের মাথায় কোনো জবাব এলো না।

'তুমি, ইকবাল জিন্দাবাদ বলছিলে, ইকবাল কে?'

'কবি স্যার। বড় কবি। মহাকবি।'

'তুমি তার কবিতা পড়েছ?'

'জি না স্যার।'

'পড় নাই–চীন ও আরব হামারা, সারা যাঁহা হ্যায় হামারা?'

'জি না স্যার।'

মেজর সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। আজিজ মাস্টার লক্ষ করল, লোকটিকে দূর থেকে যত অল্পবয়স্ক মনে হচ্ছিল আসলে তার বয়স তত অল্প নয়। চোখের নিচে কালি। কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ। কত বয়স হতে পারে? পঁয়ত্রিশের কম নয়। আজিজ মাস্টারের বয়স আটত্রিশ। এই লোকটি তার চেয়ে তিন বছরের ছোট। অথচ এই লোকটির সামনে নিজেকে কেমন কেঁচোর মতো লাগছে। মেজর সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। পা থেকে মোজা জোড়া টেনে খুলে ফেললেন। আবার প্রশ্ন-উত্তর শুরু হলো।

'এ-গ্রামে কোনো দুষ্ট লোক আছে?'

'জি না, স্যার।'
'মুক্তিবাহিনী আছে?'
'জি না, স্যার।'
'তুমি ঠিক জানো?'
'জি স্যার। এই গ্রামের সবাইকে আমি চিনি।'
'তোমার ধারণা, এই গ্রামে মুক্তিবাহিনী নেই?'
'জি না।'
মেজর সাহেব মৃদু হাসলেন। কেন হাসলেন কে জানে। তিনি কি বিশ্বাস করছেন না? আজিজ মাস্টার আবার বললেন, 'মুক্তিবাহিনী নাই স্যার।'
'শেখ মুজিবের লোকজন আছে?'
'জি না স্যার।'
'তুমি জি না স্যার ছাড়া অন্যকিছু বলছ না কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ভয় পাচ্ছ তুমি?'
'জি না স্যার।'

'গুড। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার দিকে ভালো করে তাকাও। তাকাও ভালো করে।'
আজিজ মাস্টার তাকাল। মেজর সাহেবের চোখ দুটি তার কাছে একটু নীলচে মনে হলো। বিড়াল চোখো নাকি?
'আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি খারাপ লোক?'
'জি না স্যার।'
'কফি খাবে?'

আজিজ মাস্টার চোখ তুলে তাকাল। রোগা লোকটি বলল, 'খেতে চাইলে বলেন, খাব। আমার দিকে তাকান কেন ? অভ্যাস না থাকলে বলেন, খাব না। ব্যস। বারবার আমার দিকে তাকাবেন না।'
কি, কফি খাবে?'
'জি না স্যার।'
'না কেন, খাও, কফি তৈরি হচ্ছে। তুমি কি কফির সঙ্গে ক্রিম খাও?'

আজিজ মাস্টার না বুঝেই মাথা নাড়ল। কফি এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। অতি বিস্বাদ জিনিস। আজিজ মাস্টার চুক চুক করে কফি খেতে লাগল। কাপ নামিয়ে রাখার সাহস হলো না।

'বুঝলে আজিজ, পাকিস্তানি মিলিটারির নামে আজগুবি সব গল্প ছড়ানো হচ্ছে। আমরা নাকি কোথায় কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে দুটি মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে মেরেছি। গল্পটা তোমার বিশ্বাস হয়?'

আজিজ মাস্টার জবাব দিলো না। মেজর সাহেব অনেকটা সময় নিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আমরা কাঠুরে হলে সেটা করতাম। কিন্তু আমরা কাঠুরে নই, আমরা সৈনিক। আমরা গুলি করে মারব। ঠিক না ?'
'জি স্যার।'
'হিন্দুস্থান বেতারে এসব প্রচার চালাচ্ছে, এবং অনেকেই এসব শুনছে। ঠিক না? বলো ঠিক বলছি কি না?'
'জি স্যার, ঠিক।'

'আজিজ মাস্টারের গলায় কফি আটকে গেল। তার আছে এবং সে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে।'
'কি, আছে?'
'জি স্যার।'
'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই শোন না।'
'মাঝে মাঝে শুনি স্যার।'
'শুনলেও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না। ঠিক না?'
'মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয়।'
'আজিজ!'
'জি স্যার।
'তুমি একজন সৎলোক। অন্যকেউ হলে বলত বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় তুমি মিথ্যা একেবারেই বলতে পার না। আচ্ছা, এখন বলো, আর কার ট্রানজিস্টার আছে?'
'নীলু সেনের আছে। জয়নাল মিয়ার আছে।'
'ওরা কেমন লোক?'
'ভালো লোক স্যার। নির্বিরোধী মানুষ। এই গ্রামে খারাপ মানুষ কেউ নেই।'
'তাই নাকি?'
'জি স্যার।'
'আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও। ভয়ের কিছু নাই।'
আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াল। তার মনে হলো মেজর সাহেব একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।
'স্লামালিকুম স্যার।'
'ওয়ালাইকুম সালাম।'

আজিজ মাস্টারের কেন যেন মনে হলো এক্ষুনি তাকে আবার ডাকা হবে। সে এগোতে লাগল খুব সাবধানে। কিন্তু কেউ তাকে ডাকল না। প্রায় ত্রিশ গজের মতো যাওয়ার পর সে ভয়ে ভয়ে একবার পেছনে তাকাল–মেজর সাহেব তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তার সঙ্গের রোগা লোকটিও চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে। আজিজ মাস্টারের বুক ধক করে উঠল। কেন উঠল কে জানে। একবার পেছন ফিরে আবার মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া যায় না। আজিজ মাস্টার দ্বিতীয়বার বলল, 'স্লামালিকুম।'

মেজর সাহেব তখন তাকে হাত ইশারা করে ডাকলেন। নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, 'এই যে মাস্টার সাহেব! এদিকে আসেন ভাই। স্যার ডাকেন।' আজিজ মাস্টার ফিরে এল। মেজর সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'শুনলাম তুমি কবিতা লেখ।' আজিজ মাস্টার বেকুবের মতো তাকাল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।
'এখানকার মসজিদের যে ইমাম সাহেব আছে, তার কাছে শুনলাম। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তুমি কি সত্যি কবিতা লেখ ?'
'জি স্যার।'
'বেশ। একটা কবিতা শোনাও। কবিতা আমি পছন্দ করি। শোনাও একটা কবিতা।'
আজিজ মাস্টার তাকাল নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে। সে শুকনো গলায় বলল, 'স্যার শোনাতে বলছে, শোনান। চেয়ারে বসেন। বসে শোনান। ভয়ের কিছু নাই।'

আজিজ মাস্টার হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বললেন, 'বলো, বলো, সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। লেটেস্ট কবিতাটি বলো।'
আজিজ মাস্টার যন্ত্রের মতো চার লাইন বলে গেল–
'আজি এ নিশিথে তোমারে পড়িছে মনে
হৃদয়ে যাতনা উঠিছে জাগিয়া ক্ষণে ক্ষণে,
তুমি সুন্দর চেয়ে থাকি তাই কল্পলোকের চোখে
ভালোবাসা ছাড়া নাই কিছু আর মোর মরুময় বুকে।'

নীল শার্ট সেটি অনুবাদ করে দিলো। মেজর সাহেব বললেন, 'এটিই তোমার লেটেস্ট?'
'জি স্যার।'
'ভালো হয়েছে। বেশ ভালো। তা মেয়েটি কে?'
'জি স্যার?'
'কবিতার মেয়েটি কে? ওর নাম কী?'
'মালা।'
'মেয়েটি এখানেই থাকে?'
আজিজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। শুকনো গলায় বলল, 'এইখানেই থাকে।'
'তোমার স্ত্রী নাকি?,
'জি না স্যার। আমি বিয়ে করিনি।'
'এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাও?'
আজিজ মাস্টার ঢোক গিলল। বলে কী এই লোক!
'কী বলো? চুপ করে আছ কেন? নাকি মেয়ের বাবা তোমার মতো বুড়োর কাছে বিয়ে দিতে চায় না?'
আজিজ মাস্টার খুকখুক করে কাশতে লাগল। নীল শার্ট তীক্ষ্ণগলায় বলল, 'স্যারের কথার জবাব দেন। স্যার রেগে যাচ্ছেন।'
মেজর সাহেব কৌতুহলী হয়ে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি খুশিখুশি।
'বলো, মেয়েটির বয়স কত?'
বয়স কম।'
'কত?'
'তেরো-চৌদ্দ।'

মেজর সাহেব হঠাৎ সুর পাল্টে নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটি কার? আই মিন ওর বাবার নাম কী?' আজিজ মাস্টার জবাব দিল না। মেজর সাহেব অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, 'শুধু শুধু দেরি করছ, বলে ফেল।' নীল শার্ট বলল, 'কেন শুধু শুধু রাগাচ্ছেন? বলে দেন না।'
'জয়নাল মিয়ার মেয়ে। উনার বড় মেয়ে।'

'যার বাড়িতে ট্রানজিস্টার আছে?'

আজিজ মাস্টার বেশ অবাক হলো। এই লোকটির স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। মনে রেখেছে।

'তুমি এখন আর আগের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলছ না। প্রতিটি প্রশ্ন দুবার করে করতে হচ্ছে। কারণ কী?'

আজিজ মাস্টার জবাব দিলো না।

'তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? বলো রাগ করেছ?'

'না।'

'এখন তুমি আর স্যার বলছ না কেন? নিশ্চয়ই তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।'

'জি না স্যার।'

মেজর সাহেব অনেকখানি ঝুঁকে এলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। গলার স্বর নিচে নামিয়ে বললেন, 'শোনো, ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আজ রাতে সম্ভব হবে না। আজ রাতে আমরা ব্যস্ত। কাল ভোরে। কী, তুমি খুশি তো?'

আজিজ মাস্টার তাকিয়ে রইল।

'কী, কথা বলছ না যে? বলো, শুকরিয়া।'

'শুকরিয়া!'

'আমি কথার খেলাফ করি না। যা বলেছি তা করব। এখন তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও।'

মেজর সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। নিজে একটি ধরালেন। তাঁর চোখে এখন আর হাসি ঝিকমিক করছে না।

'তোমাদের এই জঙ্গলা মাঠে কী আছে?'

'কিছু নাই। জঙ্গল।'

'আমরা জানি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ কিছু জোয়ান এবং কয়েকজন অফিসার এখানে লুকিয়ে আছে।'

আজিজ মাস্টারের চোখ বড় হয়ে গেল।

'ওরা আমাদের দুজন অফিসারকেও নিয়ে গেছে। একজন হচ্ছে আমার বন্ধু মেজর বখতিয়ার। ফুটবল প্লেয়ার।

'আমি কিছুই জানি না স্যার।'

'কিছুই জানো না?'

'জি না স্যার।'

'আমি যতদূর জানি, এ গ্রাম থেকেই তো ওদের খাবার যাচ্ছে।'

'আমি স্যার কিছুই জানি না।'

'আমি ভাবছিলাম জানো।'

'জানি না স্যার।'

মেজর সাহেব চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। প্রচণ্ড প্রস্রাবের বেগ হয়েছে আজিজ মাস্টারের। সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'স্যার আমি যাই?'
মেজর সাহেব চোখ না খুলেই বললেন, 'সেটা কি ঠিক হবে? আমরা ওদের ধরতে এসেছি। এখন তোমাকে যেতে দিলে খবরটা ওদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। পারে না?'
আজিজ মাস্টার ঢোক গিলল।

'তুমি ঐ ঘরে আজ রাতটা কাটাও। আমরা অপারেশন শুরু করব বিকেলের দিকে। আরেকটি বড় কোম্পানি আসবে আমাকে সাহায্য করতে। ওদের জন্যই অপেক্ষা করছি।'

আজিজ মাস্টারের হাঁপানির টান উঠে গেল। টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগল। মেজর সাহেব হালকা গলায় বললেন, 'তোমাকে অনেক গোপন খবর দিয়ে দিলাম। তবে অসুবিধা নেই, তুমি বন্ধু-মানুষ, যাও, ঐ ঘরে চলে যাও।'
'স্যার, আমি কিছুই জানি না।'
'জানো না সে তো আগেই বলেছ। সবাই কি আর সবকিছু জানে? জানে না। যাও, ঐ ঘরে গিয়ে বসে থাকো।'
রোদ থেকে এসেছে বলেই কি না কে জানে, এই পরিচিত ঘরও আজিজ মাস্টারের কাছে অচেনা লাগতে লাগল। অথচ এটা টিচার্স রুম। আজিজ মাস্টার রোজ এখানে বসে।
'মাস্টার সাব!'
'কে?'

আজিজ মাস্টার অবাক হয়ে দেখল একটা চেয়ারে ইমাম সাহেব জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন। ইমাম সাহেবের নাক-মুখ ফুলে গেছে। নিচের ঠোঁটটি কেটে গেছে। তাঁর সাদা পাঞ্জাবিতে রক্তের ছোপ। কাটা ঠোঁট দিয়ে হলুদ রঙের রস বেরুচ্ছে। আজিজ মাস্টার দীর্ঘ সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল এবং নিজের অজান্তেই এক সময় তার প্রস্রাব হয়ে গেল।

ইমাম সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। মেঝেতে প্রস্রাব গড়াচ্ছে। তাঁর কোনো ভাবান্তর হলো না।

৭

দিনের বেলা মীর আলির কাজ হচ্ছে পরীবানুকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে থাকা। পরীবানুর বয়স তিন। দাদাকে সে খুবই পছন্দ করে। মীর আলিও জগতের অনেক জটিল বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। মীর আলির কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সে পরীবানুর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

আজ ভোরবেলাও সে নাতনিকে কোলে নিয়ে মুড়ি খেতে বসেছিল। দাঁত না থাকায় মুড়ি চিবোতে পারে না। একগাল মুড়ি নিয়ে তাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। ঘরে আম আছে। একটা পাকা আমের রস, মুড়ির বাটিতে ঢেলে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়। অনুফা সেটা করবে না। বদি বাড়িতে না থাকলে সে তার শ্বশুরের খাওয়াদাওয়ার দিকে তেমন নজর দেয় না।

আজ তার চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ঘরে চায়ের পাতা আছে, গুড় আছে। বদি এনে রেখেছে। তার বাবার জন্যই এনেছে। তিনি নিজের কানে শুনেছেন, বদি বলছে– 'বাজানরে মাঝে মধ্যে দিও। বুড়া মানুষ। চায়ে কাশির আরাম হয়।'

মীর আলি প্রতিদিন ভোরেই বেশ সাড়ম্বরে খানিকক্ষণ কাশে, যাতে অনুফার চায়ের কথাটা মনে পড়ে। বেশির ভাগ দিনই তার মনে পড়ে না। আজও হয়তো পড়বে না। তবু সে কাশতে লাগল। কাশতে কাশতেই পরীবানুকে বলল, 'চা হইল সর্দিকাশের বড় ওষুধ। বুঝছস পরী?'
পরী উত্তর দিলো না।

'বড় জামবাটির এক বাটি চা যদি সকালে খায় কেউ, তা হইলে সর্দিকাশি, বাত সব যায়। চা-টা খুব বড় ওষুধ।'
মীর আলির জন্য আজ দিনটি সম্ভবত খুব শুভ। কারণ অনুফা তাকে এক বাটি চা এনে দিলো। সেই চায়ে তেজপাতা দেওয়ায় বেশ সুন্দর একটা গন্ধ। অভিভূত হয়ে পড়ল মীর আলি।
'মিষ্টি হইছে কি না দেখেন।'
'হইছে গো বেটি, হইছে। জবর বালা হইছে।'
অনুফাকে দু-একটা সুন্দর সুন্দর কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কী বললে সে খুশি হয় তা মীর আলির জানা নেই।
'মুড়ি চায়ের মইধ্যে ভিজাইয়া চামুচ দিয়া খান। চামুচ দিতাছি।'

মীর আলি অনুফার প্রতি বড় মমতা বোধ করল। সংসারের আয়-উন্নতি যা হচ্ছে এই মেয়েটির কারণেই হচ্ছে। ঘরে এখন চামুচ আছে। নতুন সাইকেল আছে। গত বৎসর বদি তাকে লেপ বানিয়ে দিয়েছে। বলতে গেলে গত শীত কোন দিকে গিয়েছে বুঝতেই পারা যায়নি। অথচ বদিকে বিয়ে করানোর আগে কী হাল ছিল সংসারের! সব ভাগ্য! একেকজনের একেকরকম ভাগ্য। অনুফা এ সংসারে ভাগ্য নিয়ে এসেছে। মীর আলি ভাবতে চেষ্টা করল, অনুফা এ বাড়িতে আসার পর তারা কি কখনো একবেলা না খেয়ে থেকেছে? না। নীলগঞ্জে এরকম ভাগ্য কয়জনের আছে? অথচ কত ঝামেলা বদির বিয়েতে। শেষ মুহূর্তে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। বদির মামা বলল, 'এই মেয়ের মা নাই। জামাইয়ের কোনো আদর হইত না।' কথা খুবই সত্য। কিন্তু বিয়ের কথা ঠিকঠাক হবার পর বিয়ে ভেঙে দেওয়াটা ঠিক না।

মনে খুঁতখুঁতানি নিয়ে সে ছেলে নিয়ে গেল। কী ঝড় বিয়ের রাত্রে! লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দুপুর-রাতে ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখল, ঝড়ে গ্রামে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। শুধু তার ঘরটি পড়ে গেছে। কী অলক্ষণ!

'দাদা, চা দেও।'
'পুলাপান মাইনষের চা খাওন নাই।'
'চা দেও, দাদা।'
মীর আলি হাঁক দিলো—বৌমা, আরেকটা বাটি দেও।' এই সময় এক ঝাঁক গুলি হলো। হালকা মেশিনগানের কানে তালা-ধরানো ক্যাট ক্যাট শব্দ। পরীবানু আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। মীর আলি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চায়ের বাটি উল্টে ফেলল পরীবানুর পায়ে।

নীলগঞ্জ গ্রামে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয় একটা সৈন্যদল এসে ঢুকল। তারা ঢুকল মার্চ করে। গর্বিত ভঙ্গিতে। তাদের সঙ্গে আছে চল্লিশজন রাজাকারের একটি দল। তালে তালে পা ফেলবার একটা প্রাণান্ত চেষ্টা করছে তারা। দলটি অনেক দুর থেকে আসছে। এদের চোখে-মুখে ক্লান্তি। হয়তো সারারাত ধরেই হাঁটছে, কোথাও বিশ্রাম করেনি।

বদিউজ্জামান হনহন করে হাঁটছিল। হাঁটা না বলে একে দৌড়ানো বলাই ঠিক হবে। কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় রাস্তাঘাট শুকনো। দ্রুত হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। তার একমাত্র চেষ্টা কত তাড়াতাড়ি মধুবন বাজারে গিয়ে পৌঁছানো যায়। মাঝামাঝি পথে সে মত বদলাল–ফিরে চলল নীলগঞ্জের দিকে। যা হবার হোক, এই সময় বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া ঠিক না। জঙ্গলা মাঠের কাছাকাছি আসতেই সে দ্বিতীয় মিলিটারি দলটিকে দেখতে পেল। ওরা আসছে উত্তরদিক থেকে। বদিউজ্জামান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল জঙ্গলা মাঠের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচু একটা গর্তে। সেখানে এক-কোমর পানি। তাকে কেউ সম্ভবত দেখতে পায়নি। বদিউজ্জামান এক-কোমর পানিতে ঘন্টাখানেক বসে রইল। মিলিটারিদের এই সময়ের মধ্যে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু এরা যাচ্ছে না কেন? কিছুক্ষণ পর খুব কাছেই ওদের কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। এর মানে কী?

বদিউজ্জামান মাথা উঁচু করে দেখতে চেষ্টা করল। চোখের ভুল কি না কে জানে। তার মনে হলো, মিলিটারিরা জঙ্গলা মাঠ ঘিরে বসে আছে। বদিউজ্জামান গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে একটা মোরতা ঝোপের আড়ালে মাথা ঢেকে রাখল। মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। কিন্তু পানি বেশ ঠান্ডা। বদিউজ্জামানের শীত শীত করতে লাগল। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে? গা কুটকুট করছে। সবুজ রঙের একটা গিরগিটি চোখ বড় বড় করে তাকে দেখছে। বদিউজ্জামান হাত ইশারা করে তাকে সরে যেতে বলল। রোদ বাড়ছে। ক্রমেই বাড়ছে। পচা গন্ধ আসছে পানি থেকে। পাট পচানোর গন্ধের মতো গন্ধ। গিরগিটিটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। বদিউজ্জামান মৃদুস্বরে বলল, যা হোস। আর তখনই নীলগঞ্জের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ আসতে লাগল। কী ব্যাপার?

জয়নাল মিয়া তার দলবল নিয়ে দীর্ঘ সময় ছাতিম গাছের নিচে অপেক্ষা করল। আজিজ মাস্টার ফিরে এলো না। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায়? রাসমোহন কয়েকবার বাঁশঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে। আজিজ মাস্টার চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলছে।
কিন্তু কিছুক্ষণ আগে সে এসে বলল, আজিজ মাস্টারকে আর দেখা যাচ্ছে না। এর মানেটা কী? জয়নাল মিয়া বলল, 'বিষয়ডা কী রাসমোহন?' রাসমোহন শুকনো মুখে বসে রইল।

'মাইরা ফেলছে না কি?'
'মারলে গুলির শব্দ হইত। গুলি তো হয় নাই।'
'তাও ঠিক।'

জয়নাল মিয়া মতি মিয়ার কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরাল। তার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। আর তখন মতি মিয়ার পাগল শালা নিজামকে আসতে দেখা গেল। তার মুখ হাসি-হাসি। পাগলামির অন্য কোনো লক্ষণ নেই। মতি মিয়া ধমকে উঠল, 'কই গেছিলা?'

নিজামের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হলো। ঠিক তখন গুলি ছুড়তে ছুড়তে মিলিটারি ও রাজাকারের দ্বিতীয় দলটি গ্রামে উঠে এলো। জয়নাল মিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল দক্ষিণ দিকে। বাকিরাও তাকে অনুসরণ করল। নিজাম শুধু মুখটা হাসি-হাসি করে দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত ব্যাপারটিতে সে বড় মজা পাচ্ছে।

৮

ইমাম সাহেব এক সময় বললেন, 'দোয়া ইউনুসটা দমে দমে পড়েন মাস্টার সাব।' আজিজ মাস্টার তাকাল তার দিকে, তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হয় সে কিছুই বুঝতে পারছে না। গত তিন ঘণ্টা যাবৎ এই দুটি মানুষ একসঙ্গে আছে। এই তিন ঘণ্টায় তাদের কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয়নি। আজিজ মাস্টার তার পায়জামা ভিজিয়ে ফেলার পর থেকেই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছে না।

'হযরত ইউনুস আলায়হেস সালাম মাছের পেটে এই দোয়া পড়তেন। এর মরতবাই অন্য। দোয়াটা জানেন?' আজিজ মাস্টার মাথা নাড়ল। সে জানে। কিন্তু ইমাম সাহেবের মনে হলো সে কিছুই পড়ছে-টড়ছে না। বসে আছে নির্বোধের মতো।
'মাস্টার সাব!'
'জি।'
'আমাদের সামনে খুব বড় বিপদ।'
'কেন?'
'বুঝতে পারতেছেন না?'
'না।'
'এরা কী জন্যে আসছে সেটা বলেছে?'
'হুঁ।'
'তবু বুঝতে পারতেছেন না?'
'না।'
ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। আজিজ মাস্টার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। এখান থেকে সৈন্যদলর একটা অংশ দেখা যায়। কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে, কাগজের একটা বল বানিয়ে ছুড়ে ছুড়ে মারছে এবং ক্রমাগত হাসছে। কাগজের একটা বল ছুড়ে মারার মধ্যে এত আনন্দের কী আছে কে জানে?

স্কুলঘরটি টিনের। রোদে টিন তেতে উঠেছে। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম। আজিজ মাস্টারের পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। শুধু তৃষ্ণা নয়, ক্ষুধাও বোধ হচ্ছে। বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষুধা হওয়ারই কথা। অন্য সময় এত দেরি হলে মালা খোঁজ নিত, 'মামা, ভাত বাড়ছে, আসেন।' বলেই সে চলে যেত না। দরজা ধরে এঁকেবেঁকে দাঁড়াত। যেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

গতবার ময়মনসিংহ থেকে মালার জন্য একটা আয়না কিনেছিল আজিজ মাস্টার। খুব বাহারি জিনিস। দুটো আয়না পাশাপাশি। একটি সাধারণ আয়না, অন্যটি অন্যরকম। সেটায় মুখ অনেক বড় দেখা যায়।
আয়নাটা দেওয়া ঠিক হবে কি না তা নিয়ে আজিজ মাস্টার প্রায় এক সপ্তাহ ভাবল। কেউ কিছু মনে করে বসতে পারে। তাহলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

কেউ কিছু মনে করল না। মালা অভিভূত হয়ে পড়ল। একটা আয়নায় মুখ বড় দেখায় কেন এই প্রশ্ন কয়েকবার করা হলো। এমনকি মালার মা একদিন পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'মুখ বড় দেখালে কী লাভ?' আজিজ মাস্টার লাজুক স্বরে বলেছিল, 'সাজগোজের সুবিধা হয় ভাবি।'

'কী সুবিধা?'
কী সুবিধা সেটি আর ব্যাখ্যা করতে পারেনি। কারণ এটা আজিজ মাস্টারেরও জানা ছিল না।

ইমাম সাহেব নড়েচড়ে বসলেন।

'মাস্টার সাব!'
'বলেন।'
'জোহর নামাজের ওয়াক্ত হইছে না?'
'জানি না।'
'নামাজটা পড়া দরকার। বের হয়ে ওদের কাছে পানি চাব? অজু নাই আমার।'
'দেখেন আপনি চিন্তা করে।'
'আপনি তো আর নামাজ পড়তে পারবেন না। শরীর নাপাক। গোসল লাগবে। পেশাব করে দিয়েছেন তো।'
আজিজ মাস্টার জবাব দিলো না। ইজি চেয়ারটিতে চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে পড়ে রইল। ইজি চেয়ারটি নীলু সেনের। শুয়ে থাকতে বড় আরাম।
'মাস্টার সাব। পানি চাইব নাকি?'
'আপনার ইচ্ছা হলে চান।'
'এর মধ্যে তো দোষের কিছু নেই। এরাও মুসলমান।'
'হুঁ।'
'নামাজের পানি চাইলে এরা খুশিই হবে। পাক্কা মুসলমানদের এরা খুব পেয়ার করে। এরাও তো সাচ্চা মুসলমান।'
'যান না। গিয়ে চান।'
'ভয় লাগে।'
'ভয়ের কী আছে?'
ইমাম সাহেব নড়েন না। জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারেই বসে থাকেন। চোখ বন্ধ করে ইজি চেয়ারে শুয়ে থাকতে থাকতে আজিজ মাস্টারের ঝিমুনি আসে। ঝিমুতে ঝিমুতে একসময় ঘুমিয়েও পড়ে। এর মধ্যেই ছাড়া ছাড়া বেশ কয়েকটি স্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পারে এগুলো স্বপ্ন। তবু তার ভালোই লাগে।

ইমাম সাহেব বিরক্তমুখে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। এ কেমন মানুষ–ঘুমিয়ে পড়েছে! তিনি মৃদুস্বরে ডাকেন, 'এই যে মাস্টার সাব! এই!' আজিজ মাস্টার নড়েচড়ে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না।

নীলু সেন গত রাতে এক পলকের জন্যও ঘুমুতে পারেনি। দোতলার যে-ঘরটিতে তাঁর বিছানা সে-ঘরের বারান্দায় গড়াগড়ি করেছে। নীলু সেনের বোন-পো বলাই চোখ বড় বড় করে মামার অবস্থা দেখেছে। রাত দুটোর দিকে বলাই ঠিক করল, মামার জন্য ডাক্তার আনতে সরাইল বাজারে যাবে। পথঘাট এখন শুকনো। বদিউজ্জামানের সাইকেল নিয়ে যাওয়া যাবে। নীলু সেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'এতক্ষণ বাঁচব না রে বলাই, এতক্ষণ বাঁচব না।' বলাইয়েরও তাই ধারণা হলো। এত কষ্ট সহ্য করে কেউ দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়।

'ব্যথাটা কোথায়?'
'তলপেটে।'
বলাই দ্বিতীয় প্রশ্নের সময় পেল না। নীলু সেনের মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুতে লাগল। সময় শেষ হয়েছে বোধহয়। এতবড় বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী। বলাইয়ের ভয় করতে লাগল। কী সর্বনাশ! এ কী বিপদ!
'মামা, গ্রামের দুই-একজন মানুষরে ডাক দিয়া আনি?'
'তুই নড়িস না। আমার সময় শেষ।'
বলাই মামার হাত ধরে বসে রইল। তার কাছে মনে হলো, মামার গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। বলাই ঘামতে লাগল। কিন্তু শেষ রাত্রে হঠাৎ ব্যথা কমে গেল। নীলু সেন শান্তস্বরে বলল, 'ব্যথা নাই। বলাই, ঠান্ডা পানি দে এক গ্লাস।'
বলাই পানি এনে দেখে মামা মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।
নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। বড় মায়া লাগে দেখে।
গ্রামে মিলিটারি আসার এতবড় একটা খবরেও বলাই তাঁর ঘুম ভাঙাল না। আহা বেচারা, ঘুমাক!
নীলু সেনের ঘুম ভাঙাল মিলিটারিরা। ডাকাডাকি, হইচই শুনে নীলু সেন দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বের করল। কী ব্যাপার? নীলশার্ট পরা একটি লোক বলল, 'আপনার নাম কি নীলু? নীলু সেন?'
'জে আজ্ঞে।'
'আপনার বাড়িতে আর কে আছে?'
'বলাই। আমার বোন-পো বলাই। আপনারা কে?'
'বলাইকে নিয়ে নিচে নেমে আসেন।'
নীলু সেন বলাইকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। গায়ে একটা পাতলা সুজনি চড়িয়ে নিচে নেমে এলেন। ভারী দরজা খুলতে সময় লাগল। বাইরে থেকে অসহিষ্ণু কণ্ঠে কে যেন বলল, 'এত সময় লাগছে কেন?'
নীলু সেন কিছুই বুঝতে পারছে না। তাঁর ঘুমের ঘোরও বোধহয় ভালোমতো কাটেনি। সে দরজা খুলে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আদাব।'

তার কথা শেষ হবার আগেই চার-পাঁচটা গুলির শব্দ হলো। নীলু সেন কাত হয়ে পড়ে গেলেন দরজার পাশে। কোনো চিৎকার না। নিঃশব্দ মৃত্যু। নীল শার্ট পরা লোকটি ডাকল, 'বলাই! বলাই!'

৯

বদিউজ্জামান মাথা নিচু করে কয়েক ঢোক পানি খেল। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। তার মনে হলো, পায়ে আর কোনো বোধশক্তি নেই। মাথা কেমন যেন করছে। গিরগিটিটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। এর চোখ দুটি মানুষের মতো। মনে হয় হাসছে। বুড়ো মানুষের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে হাসা। সে হাত ইশারা করে গিরগিটিটাকে বিদেয় করতে চাইল। কিন্তু সে যাচ্ছে না, তাকিয়ে আছে।

আচ্ছা, মিলিটারিদের সম্পর্কে যেসব গল্প শোনা যায় সেগুলি সত্যি? শুধু শুধু এরা মানুষ মারবে কেন? এরা নাকি নতুন কোনো জায়গায় গেলেই প্রথম ধাক্কায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন মানুষ মেরে ফেলে ভয় দেখাবার জন্য? এটা একটা কথা হলো? সব গুজব। এরাও তো আল্লাহর বান্দা। মিলিটারিও মানুষ, রক্ত একটু গরম এই আর কী। এটা তো দোষের কিছু না। পোশাকটাই এরকম। গায়ে দিলে রক্ত গরম হয়ে যায়।

বদিউজ্জামান খুকখুক করে দুবার কাশল। নিজের কাশির শব্দে নিজেই চমকে উঠল। কেমন বেকুবের মতো কাণ্ড করছে। নির্জন জায়গা। অল্প শব্দ হলেই অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আবার কাশি আসছে। বদিউজ্জামান কাশি সামলাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘড়ঘড় একটা শব্দ বের করল। গিরগিটিটা ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছে। না, যাচ্ছে না। আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। পানি খেতে এসেছে বোধহয়। তাকে দেখে পানি খাবার সাহস হচ্ছে না, আবার তৃষ্ণা নিয়ে চলেও যেতে পারছে না।

বদির আবার তৃষ্ণা বোধ হলো। সে মাথা নিচু করে কয়েক ঢোক পানি খেল।

১০

নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, 'আপনারা দুজন আসেন আমার সঙ্গে।' আজিজ মাস্টার তাকাল ইমাম সাহেবের দিকে। ইমাম সাহেব ভীতস্বরে বললেন, 'কোথায়?' নীল শার্ট পরা লোকটির মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। তাকে কোনো প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করার সাহস হয় না। তবু ইমাম সাহেব দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?'
'বিলের কাছে।'
'কেন?'
'মেজর সাহেব নিয়ে যেতে বলেছেন।'
'কী জন্যে?'
'এত কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। আপনারা ওঠেন। মেজর সাহেব অপেক্ষা করছেন।'
'বড় ভয় লাগতেছে ভাই।'
'ভয়ের কিছু নাই, আসেন।'

আজিজ মাস্টার একটি কথাও বলল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো। সবার শেষে বেরুলেন ইমাম সাহেব। তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।

স্কুলঘরের বারান্দায় কেউ নেই। ধু-ধু করছে চারদিক। বসে থাকা সেপাইরা কখন গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে কে জানে। ঘরের ভেতরে বসে কিছুই বোঝা যায়নি। হয়তো কোনো পাহারা-টাহারা ছিল না। ইচ্ছে করলেই পালিয়ে যাওয়া যেত। ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'এরা সব কোথায় গেল?'
নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, 'বেশি কথা বলবেন না। আপনারা মৌলবি মুসল্লিরা বেশি কথা বলেন আর ঝামেলার সৃষ্টি করেন। কম কথা বলবেন।'
'জি আচ্ছা।'
ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক পর্যন্ত তারা এগোল নিঃশব্দে। জুম্মাঘরের পাশে আট-নয়জন সেপাইয়ের একটি দল দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ইমাম সাহেবের ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তিনি নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, 'ভাই, আপনার নাম কী?'
'রফিক।'
'রফিক সাহেব, আমার জোহরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে। পানির অভাবে অজু করতে পারি নাই।'
রফিক তার কোনো জবাব দিলো না। আগে আগে হাঁটতে লাগল। কোথাও কোনো মানুষজন নেই। গ্রামের সবাই কি ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে নাকি? ইমাম সাহেব বললেন, 'ভাই, আপনার দেশ কোথায়? বাড়ি কোন জিলায়?'

'বাড়ি দিয়ে কী করবেন?'
'না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আমার দেশ কুমিল্লা। নবীনগর।'
'ভালো।'
'সামনের মাসে ইনশাল্লাহ দেশে যাব। বহুত দিন যাই না।'
রফিক কিছুই বলল না। সে হাঁটছে মাথা নিচু করে। এমনভাবে হাঁটছে যেন পথঘাট ভালো চেনা। কিন্তু এ লোকটি এই গ্রামে আগে কখনো আসেনি। আজিজ মাস্টার বলল, 'মেজ সাহেব কেন ডেকেছেন আপনি জানেন?'
'জানি।'
'জানলে আমাদের বলেন।'
রফিক নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'একটা অপরাধীর বিচার হবে। ওর নাম মনা। সে খুন করেছে। সেই খুন নিয়ে কোনো থানা-পুলিশ হয়নি। এক বুড়ি নালিশ করেছে মেজর সাহেবের কাছে। ঐ বুড়ির নাম চিত্রা বুড়ি।'
ইমাম সাহেব বললেন, 'চিত্রা বুড়ি! খুব বজ্জাত। মসজিদের একটা বদনা চুরি করেছে।'
'বদনা চুরি করুক আর না করুক, মেজর সাহেব তার কথা শুনে খুব রাগ করেছেন। মনাকে ধরা হয়েছে। কঠিন শাস্তি হবে।'
আজিজ মাস্টার ক্ষীণস্বরে বলল, 'কী শাস্তি?'
'মিলিটারিদের তো আর জেল-হাজত নাই যে জেলে ঢুকিয়ে দেবে! ওদের শাস্তি একটাই। ছোট অপরাধের জন্য যে শাস্তি, বড় অপরাধের জন্যও সেই শাস্তি।'
'কী সেটা?'
'বুঝতেই তো পারছেন, আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?'
ইমাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, 'আমরা গিয়ে কী করব?'
'আপনারা শাস্তি দেখবেন।'
'শাস্তি দেখব?'
'হ্যাঁ। এর দরকার আছে।'
'কী দরকার?'
'মেজর সাহেবের ধারণা, এটা দেখার পর আপনারা তার কথা শুনবেন। কোনোকিছু জিজ্ঞেস করলে সোজাসুজি জবাব দেবেন।'
'ও।'
'শুনেন ইমাম সাহেব, আপনি কথা বেশি বলেন। কথা বেশি বলে একবার মার খেয়েছেন। কথা খুব কম বলবেন।'
'জি আচ্ছা।'
'নিজের থেকে কোনো কথা বলবেন না। এখন সময় খারাপ।'
'জি, তা ঠিক।'
ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন।

মীর আলি বাড়ির উঠোনে বসে ছিল। আজ বাড়িতে রান্না হয়নি। খিদের যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে পড়ল। এই বয়সে খিদে সহ্য হয় না। অনুফাকে কয়েকবার ভাতের কথা বলাও হয়েছে। কিন্তু অনুফা কিছুই করছে না। সে ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। ভাত রাঁধায় তার মন নেই। ভয় মীর আলিরও লাগছে। কিন্তু খিদের কষ্ট বড় কষ্ট।

আজিজ মাস্টাররা তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় সে একথালা মুড়ি নিয়ে বসেছিল। এই বয়সে মুড়ি চিবোতে কষ্ট হয়, তবু চিবোতে হয়। যা ভাবসাব তাতে মনে হচ্ছে, আজ আর রান্না হবে না। পায়ের শব্দে মীর আলি চমকে উঠে বলল, 'কেডা যায়?'

'আমি আজিজ। আজিজ মাস্টার।'

'তোমার সঙ্গে কেডা যায়?'

'আজিজ মাস্টার জবাব দিলো না।'

'কথা কও না যে, ও মাস্টার! মাস্টার!'

রফিক বলল, 'দাঁড়াবেন না, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ও মাস্টার, কে কথা কয়?'

রফিক শীতল স্বরে বলল, 'আমার নাম রফিক। চাচা মিয়া, আপনি ঘরের ভেতরে গিয়ে বসেন।'

'মাস্টার, এই লোকটা কে? মিলিটারি?'

'না। আমি মিলিটারি না।'

'আপনার বাড়ি কোন গ্রাম?'

রফিক তার জবাব দিলো না। হাঁটতে শুরু করল। ইমাম সাহেব তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছেন না। ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছেন। তার জন্য দুজনকেই মাঝে মাঝে দাঁড়াতে হচ্ছে। রফিক বলল, 'হাঁটতে কষ্ট হলে আমার হাত ধরে হাঁটেন।'

'জি না। কোনো কষ্ট নাই।'

'লজ্জার কিছু নাই। আমার হাত ধরে হাঁটেন।'

'শুকরিয়া! ভাই আপনার বয়স কত?'

'আমার বয়স দিয়ে কী করবেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

'আপনাকে তো বলেছি বিনা প্রয়োজনে কথা বলবেন না।'

'জি আচ্ছা।'

'আমার বয়স তিরিশ।'

রফিককে দেখে বয়স আরও বেশি মনে হয়। রোগা এবং লম্বা। ছোট ছোট চোখ। কথা বললে চোখ আরও ছোট হয়ে যায়। মনে হয় লোকটি যেন চোখ বন্ধ করে কথা বলছে।

ইমাম সাহেব দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। লা ইলাহা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজজুয়ালেমিন।

মনা কৈবর্ত তার এগারো বছরের ভাইকে নিয়ে তেঁতুল গাছের নিচে চুপচাপ বসে আছে। মনার শরীর বিশাল, প্রায় দৈত্যের মতো। তার ভাইটি অসম্ভব রোগা। সে মনার লুঙ্গির এক প্রান্ত শক্ত করে ধরে আছে। তাকাচ্ছে সবার মুখের দিকে। বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনাকে খুব একটা বিচলিত মনে হচ্ছে না।

মেজর সাহেব প্রায় দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। তার সঙ্গে একজন নন-কমিশন্ড অফিসার। এরা দুজন নিচুগলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। মেজর সাহেব সম্ভবত কোনো রসিকতা করলেন। দুজনেই উঁচুগলায় হাসতে শুরু করলেন। মনার ভাইটি চোখ বড় বড় করে তাকাল তাদের দিকে। বিলের পাড়ের উঁচু জায়গায় একদল রাজাকার দাঁড়িয়ে। খুব কাছেই মিলিটারি আছে বলেই হয়তো তারা বুক ফুলিয়ে আছে। অহংকারী গর্বিত ভঙ্গি। এদের মধ্যে শুধু দুজনের পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। বাকি কারো পায়ে কিছু নেই। এরা নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে কথা বলছে। তবে এদের মুখ শুকনো। ভয়-পাওয়া চোখ।

মেজর সাহেব এগিয়ে এলেন মনার দিকে। মনার ছোট ভাইটি শক্ত হয়ে গেল। মনার সঙ্গে মেজর সাহেবের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো। কথাবার্তা হলো রফিকের মাধ্যমে। আজিজ মাস্টার ও ইমাম সাহেবকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তারা বসে রইল বিলের পাড়ে। প্রশ্নোত্তর শুরু হলো।

'তুমি একটি খুন করেছ?'

মনা জবাব দিলো না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

'চুপ করে থাকবে না। স্পষ্ট জবাব দাও। বলো, হ্যাঁ কিংবা না।'

'হ্যাঁ।'

'গুড। স্পষ্ট জবাব আমি পছন্দ করি। এখন বলো—কেন করেছ? বিনা কারণে তো কেউ মানুষ মারে না।'

'হে আমার পরিবারের সঙ্গে খারাপ কাম করছে।'

'তাই নাকি?'

'জে আজ্ঞে।'

'উত্তেজিত হবার মতোই একটি ব্যাপার। তোমার স্ত্রীকে কি শাস্তি দিয়েছ?'

মনা মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। জবাব দিলো না। প্রশ্নের ধারা সে বুঝতে পারছে না।

'বলো বলো। কুইক। সময় বেশি নেই আমার হাতে।'

মনা ঘামতে শুরু করেছে।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি কোনো শাস্তি দাওনি।'

'জি-না।'

'সে নিশ্চয়ই খুব রূপবতী?'

মনা চোখ তুলে তাকাল। কিছুই বলল না।

'বলো। চট করে বলো। সে কি রূপবতী?'

'জি।'

'তাহলে অবশ্য শাস্তি না দিয়ে ভালোই করেছ। একটি সুন্দরী নারীকে শাস্তি দেওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। তোমার স্ত্রীর নাম কী?'

মনার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। মেজর সাহেবের কথাবার্তা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

'বলো, তোমার স্ত্রীর নাম বলো।'

মনা কিছুই বলল না। রফিক বলল, 'গ্রামের মানুষরা অপরিচিত মানুষের কাছে স্ত্রীর নাম বলে না।'

'কেন বলে না?'

'আমি জানি না, স্যার।'

'তুমি তো অনেক কিছুই জানো। এটা জানো না?'
'আমি অনেক কিছু জানি না।'
মেজর সাহেব মনার দিকে আরও কয়েক পা এগুলেন। আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'এই ছেলেটি কী হয় তোমার?'
'এ আমার ছোট ভাই।'
'ওর নাম কী?'
'বিরু।'

মেজর সাহেব তাকালেন বিরুর দিকে। বিরু কুঁকড়ে গেল। মেজর সাহেব শান্তস্বরে বললেন, 'বিরু, তুমি লুঙ্গি ধরে টানাটানি করছ কেন? লুঙ্গি ছেড়ে দাও।' বিরু লুঙ্গি ছেড়ে দিলো না। আরও ঘেঁষে গেল ভাইয়ের দিকে। তার চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া পড়েছে। শিশুরা অনেক কিছু আগেই বুঝতে পারে। সেও হয়তো পারছে।
'মনা।'
'জি।'
'তুমি বড় একটা অন্যায় করেছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার শাস্তি হবে। তোমার কি কিছু বলার আছে?'

মনা তাকিয়ে রইল। তার চোখে পলক পড়ছে না। মেজর সাহেব সিগারেট ধরালেন। অস্থির ভঙ্গিতে দৃঢ়স্বরে বললেন, 'এই দুজনকে পানিতে দাঁড় করিয়ে দাও।' রফিক ইংরেজিতে বলল, 'এই বাচ্চাটিকেও?'
'হ্যাঁ।'
'স্যার, এর কি কোনো প্রয়োজন আছে?'
'প্রয়োজন আছে। এর প্রয়োজন আছে। আমি নিষ্ঠুরতার একটা নমুনা দেখাতে চাই।'
'স্যার, তার কোনো প্রয়োজন নাই।'
'প্রয়োজন আছে। আজ এই ঘটনাটি ঘটবার পর মিলিটারির নাম শুনলে ওরা কাপড় নষ্ট করে দেবে। গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত হয়ে যাবে।'
'তাতে কী লাভ স্যার?'
'লাভ-লোকসান আমার দেখার কথা, তোমার না। আমার সঙ্গে তর্ক করবে না।'
রফিক চুপ করে গেল। মেজর সাহেব তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'এসব কথা পরবর্তী সময়ে কেউ মনে রাখবে না। অত্যাচারী রাজারা ইতিহাসে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মানিত হন। আলেকজান্ডারের নৃশংসতার কথা কি কেউ জানে? সবাই জানে, আলেকজান্ডার দি গ্রেট।'
রফিক কিছুই বলল না। মেজর সাহেব সহজ সুরে বললেন, 'যা করতে বলা হয়েছে, করো। আর শোনো, ঐ ইমাম এবং ঐ মাস্টার–ওদের দুজনকে খুব কাছাকাছি কোথাও বসিয়ে দাও। আমি চাই যাতে ওরা খুব ভালোভাবে দৃশ্যটা দেখে।'
'ঠিক আছে, স্যার।'
'বাই দা ওয়ে, আমি দেখলাম, ঐ ইমাম তোমার হাত ধরে ধরে আসছে? কী ব্যাপার?'
'হাঁটতে পারছিল না।'
'ঠিকই পারবে। দৃশ্যটি তাদের দেখতে দাও, তারপর ওদের হাঁটতে বললে হাঁটবে, দৌড়াতে বললে দৌড়াবে। লাফাতে বললে লাফাবে। ঠিক নয় কি?'

'হয়তো ঠিক।'
'হয়তো বলছ কেন? তোমার সন্দেহ আছে?'
'জি না, স্যার।'
'গুড। সন্দেহ থাকা উচিত নয়। রফিক!'
'জি স্যার।'
'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরুব। গ্রামটি ভালোমতো ঘুরে দেখতে চাই।'
'ঠিক আছে স্যার।'
'মনে হয় দেখার মতো ইন্টারেস্টিং অনেক কিছুই আছে এ গ্রামে।'
'কিছুই নেই স্যার। এটা একটা দরিদ্র গ্রাম।'

রাজাকাররা মনা আর তার ভাইটিকে ঠেলে পানিতে নামিয়ে দিলো। বিরু তার ভাইয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। সে কাঁপছে থরথর করে। মনা এক হাতে তার ভাইকে ধরে আছে।

রাইফেল তাক করামাত্র বিরু চিৎকার করতে লাগল, 'দাদা, বড় ভয় লাগে! ও দাদা, ভয় লাগে!' মনা মৃদুস্বরে বলল, 'ভয় নাই। আমাকে শক্ত কইরা ধর্।' বিরু প্রাণপণ শক্তিতে ভাইকে আঁকড়ে ধরল।

ইমাম সাহেব গুলি হবার সময়টাতে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এবং তার পরপরই মুখভর্তি করে বমি করলেন। আজিজ মাস্টার সমস্ত ব্যাপারটি চোখের সামনে ঘটতে দেখল। এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

১১

আলো মরে আসছে।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেজর সাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী রফিক, বৃষ্টি হবে?'
'হতে পারে। এটা ঝড়বৃষ্টির সময়।'
'তোমার দেশের এই ঝড়বৃষ্টিটা ভালোই লাগে।'
রফিক মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার দেশ বললেন কেন?'
মেজর সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না।
কোথাও কোনো শব্দ নেই। যেন গ্রামে কোনো জনমানুষ নেই। মেজর সাহেব হালকা গলায় বললেন, 'মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবার একটা আলাদা আনন্দ আছে। আছে না?'
রফিক জবাব দিলো না। মেজর সাহেব বললেন, 'মানুষের ইনস্টিংক্ট-এর মধ্যে এটা আছে। অন্যকে পায়ের নিচে রাখার আকাঙ্ক্ষা। তোমার নাই?'
'না।'
'আছে, তোমারও আছে। সবারই আছে। থাকতেই হবে।'
রফিক কিছু বলল না। তারা হাঁটছে পাশাপাশি। মেজর সাহেব কথা বলছেন বন্ধুর মতো। তার কথার ধরন দেখে মনে হয় রফিককে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন।

বদিউজ্জামানের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় মীর আলি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'কেডা যায়? কেডা যায়, জয়নাল মিয়া?'

মেজর সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। রফিক বলল, 'লোকটা স্যার অন্ধ।' মেজর সাহেবকে মনে হলো এই খবরে বেশ উৎসাহ বোধ করছেন।

'কে লোকটি, কথা বলে না কেডা গো?'

'আমি রফিক।'

'রফিকটা কেডা? কোন বাড়ির?'

'ঘরের ভেতর গিয়ে বসেন চাচা।'

মেজর সাহেব ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তুমি ওকে কী বললে?'

রফিক ইংরেজিতে বলল, 'আমি তাঁকে ঘরে যেতে বললাম।'

'কেন?'

'এমনি বললাম।'

মীর আলি ভয়-পাওয়া গলায় চেঁচাল, 'এরা কে? এরা কে?'

মেজর সাহেব বললেন, 'তুমি ওকে বলো আমি মেজর এজাজ আহমেদ, কমান্ডিং অফিসার, ফিফটি এইটথ্ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন।'

'স্যার বাদ দেন। বুড়ো মানুষ।'

'তোমাকে বলতে বলেছি, তুমি বলো। যাও, কাছে গিয়ে বলো।'

রফিক এগিয়ে গেল। মেজর সাহেব তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। তিনি কি বুড়োর চোখে-মুখে কোনো পরিবর্তন দেখতে চাচ্ছিলেন? কোনোরকম পরিবর্তন অবশ্য দেখা গেল না। রফিক ফিরে আসতেই মেজর সাহেব বললেন, 'তুমি এই অন্ধ বুড়োকে বলো, মেজর সাহেব আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন।'

রফিক তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও।'

রফিক এগিয়ে গেল। বুড়ো মীর আলি কিছুই বলল না। মাথা নিচু করে বসেই রইল।

আকাশে মেঘ জমছে। প্রচুর মেঘ। কালবৈশাখী হবে নিশ্চয়ই। তারা হাঁটছে নিঃশব্দে। রফিক একটি সিগারেট ধরিয়েছে। মেজর সাহেব তাকে মাঝে মাঝে লক্ষ করছেন।

'রফিক!'

'জি স্যার।'

'তুমি তো জানতে চাইলে না আমি ওকে সালাম জানালাম কেন। জানতে চাও না?'

রফিক কিছু বলল না।

রেশোবা গ্রামে আমার যে বৃদ্ধ বাবা আছেন তিনি অন্ধ। তিনিও বাড়ির উঠোনে এই বুড়োটির মতো বসে থাকেন। পায়ের শব্দ পেলেই এই বুড়োটির মতো বলেন, 'ইয়ে কৌন?'

'পৃথিবীর সব জায়গার মানুষই আসলে এক রকম।'

'কথাটি কি তুমি বিশেষ কোনো কারণে বললে?'

'না, কোনো বিশেষ কারণে বলিনি।'

'রফিক, আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। সারভাইভালের প্রশ্ন। এই সময়ে অন্যায় কিছু হবেই। উল্টোটা যদি হতো–ধরো বাঙালি সৈন্য আমার গ্রামে ঠিক আমাদের মতো অবস্থায় আছে, তখন তারা কী করত? বলো, কী করত তারা? যে অন্যায় আমরা করছি তারা কি সেগুলো করত না?'

'না।'

'না? কী বলছ তুমি! যুক্তি দিয়ে কথা বলো। রাগ, ঘৃণা, হিংসা আমাদের মধ্যে আছে, তোমাদের মধ্যেও আছে।'

রফিক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত ইশারা করে বলল, 'এরা ডেডবডিটা এখনো সরায়নি। মেজর সাহেব দেখলেন, দরজার পাশে বুড়োমতো একটি লোক কাত হয়ে পড়ে আছে। নীল রঙের বড় বড় মাছি ভনভন করে উড়ছে চারদিকে।

'স্যার, এই লোকটির নাম নীলু সেন।'

'এর কি কোনো আত্মীয়স্বজন নেই? এভাবে ফেলে রেখেছে কেন?'

'রফিক গলা উঁচিয়ে ডাকল, বলাই, বলাই! কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।'

'কাকে ডাকছিলে?'

'বলাইকে। ওর ছেলে কিংবা এরকম কিছু। এরা দুজন এই বাড়িতে থাকে।'

'এত বড় একটা বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী থাকে?'

'এখন থাকে একটি।'

'রফিক!'

'জি স্যার!'

'আমার মনে হয়, তুমি সূক্ষ্মভাবে আমাকে কিছু বলবার চেষ্টা করছ।'

'স্যার, আমি কিছুই বলবার চেষ্টা করছি না। এখন যা বলার তা আপনি বলবেন। আমি শুধু শুনব।'

'এর মানে কী?'

'কোনো মানে নাই, স্যার। আপনি এত মানে খুঁজছেন কেন?'

দুজন আবার হাঁটতে শুরু করল। কালীমন্দিরের সামনে মেজর সাহেব থামলেন। কালীমূর্তি তিনি এর আগে দেখেননি। একটি মাত্র দরজা খোলা, পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। মেজর সাহেব ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখতে চাইলেন। রফিক বলল, 'স্যার, ঝড় হবার সম্ভাবনা। আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত।'

'ফিরব। তোমাদের কালীমূর্তি দেখে যাই।'

'তোমাদের বলা ঠিক নয় স্যার। আমি মুসলমান।'

'তোমরা মাত্র পঁচিশ ভাগ মুসলমান, বাকি পঁচাত্তর ভাগ হিন্দু। তুমি মন্দিরে ঢুকে মূর্তিকে প্রণাম করলেও আমি কিছুমাত্র অবাক হব না।'

রফিক কোনো জবাব দিলো না। মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে আগ্রহ নিয়ে মূর্তি দেখলেন। হাসিমুখে বললেন, 'চারটি হাতে এই মহিলাটিকে মাকড়সার মতো লাগছে। লাগছে না?'

'আমার কাছে লাগছে না। আমরা ছোটবেলা থেকেই মূর্তিগুলো এরকম দেখে আসছি। আমার কাছে এটাকেই স্বাভাবিক মনে হয়।'

মেজর সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় বললেন, 'রফিক!'

'জি স্যার!'

'এই মূর্তিটির পেছনে একজন কেউ লুকিয়ে আছে।'

রফিক চুপ করে রইল।

'তুমি সেটা আমার আগেই বুঝতে পেরেছ। পারোনি?'
রফিক জবাব দিলো না।
'বুঝতে পেরেও আমাকে কিছু বলোনি।'
রফিক ক্লান্তস্বরে ডাকল, 'বলাই!'
মূর্তির পেছনে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠল।
'তুমি কী করে বুঝলে ও বলাই?'
'আমি অনুমান করছি। মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে, তাই অনুমান করছি। বলাই নাও হতে পারে। হয়তো অন্যকেউ। হয়তো কানাই।'
'মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে সে কি ভাবছে মা কালী ওকে রক্ষা করবে?'
'ভাবাই তো স্বাভাবিক। অনেক মুসলমান এরকম অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়। ভাবে, আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন।'
মেজর সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। রফিক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'অনেক জায়গায় মসজিদ থেকে টেনে বের করে ওদের মারা হয়েছে। আল্লাহ তাদের রক্ষা করতে পারেননি।'
'তুমি কী বলতে চাচ্ছ?'
'আপনি যদি বলাইকে মারতে চান কালীমূর্তি ওকে রক্ষা করতে পারবে না। এটাই বলতে চাচ্ছি, এর বেশি কিছু না।'
'ওকে বের হয়ে আসতে বলো।' রফিক ডাকল, 'বলাই, বলাই!' বলাই জবাব দিলো না।

একটা মৃদু ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় শুরু হলো। প্রচণ্ড ঝড়। মেজর সাহেব মন্দিরের ভেতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হুম হুম শব্দ উঠছে। দেখতে দেখতে আবহাওয়া রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। মন্দির-সংলগ্ন বাঁশঝাড়ে ভয়-ধরানো শব্দ হতে লাগল। রফিক এসে দাঁড়াল মেজর সাহেবের পাশে। মেজর সাহেব মুগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'বিউটিফুল!' কালীমূর্তির পেছনে উবু হয়ে বসে থাকা বলাইয়ের কথা তাঁর মনে রইল না। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মেজর সাহেব দ্বিতীয়বার বললেন, 'বিউটিফুল!'

সামনে খোলা মাঠ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মাঠে ধূলি ও শুকনো পাতায় ঘূর্ণির মতো উঠেছে। এর মধ্যেই খালি গায়ে একজনকে ছুটে যেতে দেখা গেল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে মহা উল্লসিত। মেজর সাহেব বললেন, 'লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ?' রফিক নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'ও নিজাম, পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটি করে পাগল থাকে।'
'এ গ্রামে সবাইকে কি তুমি এর মধ্যেই চিনে ফেলেছ?'
'না, কয়েকজনকে চিনি। সবাইকে না।'
'ঐ পাগলটা কি জঙ্গলা মাঠের দিকে যাচ্ছে না?'
'মনে হয় যাচ্ছে। পাগলরা বনজঙ্গল খুব পছন্দ করে। মানুষের চেয়ে গাছকে তারা বড় বন্ধু মনে করে।'
'রফিক!'
'জি স্যার।'
'তোমার পড়াশোনা কতদূর?'
'পাসকোর্সে বিএ পাশ করেছি।'
'মাঝে মাঝে তুমি ফিলসফারদের মতো কথা বলো।'

'পরিবেশের জন্য এরকম মনে হয়। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে সাধারণ কথাও খুব অসাধারণ মনে হয়।'
'তা ঠিক।'

মেজর সাহেব মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঝড়ের চাপ ক্রমেই বাড়ছে। মন্দিরের একটা জানালা খুলে গিয়েছে। খটখট শব্দে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। রফিক বলল, 'স্যার কি ভেতরে গিয়ে বসবেন?'
'না।'
পাগলা নিজাম সত্যি সত্যি কি বনের ভেতর ঢুকেছে? মেজর সাহেব তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তাকে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হচ্ছে। কপালে ভাঁজ পড়েছে।
'রফিক!'
'জি স্যার।'
'জর্জ বার্নাড শ মিলিটারি অফিসার সম্পর্কে কী বলেছেন জানো?'
'জানি না স্যার।'
'তিনি বলেছেন, দশজন মিলিটারি অফিসারের মধ্যে নজনই হয় বোকা। বাকি একজন রামবোকা।'
'জর্জ বার্নাড শ'র রচনা আমাদের সিলেবাসে ছিল না। আমি তাঁর কোনো লেখা পড়ি নি।'
'লোকটি রসিক। তবে তার কথা ঠিক নয়। মাঝে মাঝে মিলিটারি অফিসারদের মধ্যেও বুদ্ধিমান লোক থাকে। যেমন আমি। ঠিক না?'
'জি স্যার।'
'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি যাকে পাগল বলছ সে পাগল নয়। সে জঙ্গলা মাঠে যাচ্ছে খবর দিতে।'
'নিজাম আলি পাগল। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'
'কী কথা হয়েছে?'
'পাগলদের সঙ্গে যেরকম কথা হয় সেরকম। বিশেষ কিছু না।'
'বুঝলে কী করে ও পাগল?'
'ও মিলিটারি আসায় অত্যন্ত খুশি হয়েছে। এর থেকেই বুঝেছি।'
'তুমি বলতে চাও মিলিটারি আসাটা কোনো আনন্দের ব্যাপার নয়?'
'জি না, স্যার।'
মেজর সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করে দূরের বনের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'চলো যাই।'
'কোথায়?'
'স্কুলে ফিরে যাই।'
'এই ঝড়ের মধ্যে?'
'হ্যাঁ।'

মেজর সাহেব মন্দিরের চাতাল থেকে নেমে পড়লেন। ঝড়ে উড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। কিন্তু তিনি হাঁটছেন স্বাভাবিক-ভাবেই। সাপের শিসের মতো শিস দিচ্ছে বাতাস। জুম্মাঘরের কাছাকাছি আসতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। মেজর এজাজ আহমেদ সেই বৃষ্টি গ্রাহ্যই করলেন না।
নিজের মনে গুনগুন করতে লাগলেন। কিংস্টোন ট্রেয়োর একটি গান, যার সঙ্গে বর্তমান পরিবেশ সমস্যার কোনো সম্পর্কই নেই।

Pretty girls are everywhere
And when you call me I will be there.

মেজর সাহেবের গলা বেশ সুন্দর।

১২

ঝড় স্থায়ী হলো আধঘন্টার মতো।

ঝড়ে গ্রামের কারও তেমন কোনো ক্ষতি হলো না। শুধু বদিউজ্জামানের নতুন টিনের বাড়িটির ছাদ উড়ে গেল। মীর আলি আতঙ্কে অস্থির হয়ে চেঁচাতে লাগল। অনুফা কী করবে ভেবে পেল না। তাদের বাড়ি গ্রামের বাইরে। ছুটে গ্রামে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। গোয়ালঘরটি এখনো টিকে আছে। সেখানে যাওয়া যায়। কিন্তু বাতাসের বেগ এখনো কমেনি। সেই নড়বড়ে চালা কখন মাথার উপর পড়ে তার ঠিক কী? সে পরীবানুকে কোলে নিয়ে তার শ্বশুরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মীর আলি ভাঙা গলায় চেঁচাতে লাগল, 'বদি! বদিরে, ও বদিউজ্জামান!'

বদিউজ্জামানের চোখ জবাফুলের মতো লাল। এখন আর তার আগের মতো কষ্টবোধ হচ্ছে না। পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভালোই লাগছে। ঝড়বৃষ্টির সময় সে নিজের মনে খানিকক্ষণ হেসেছে। কেন হেসেছে সে জানে না। কোনো কারণ ছাড়াই হাসি এসেছে। বদিউজ্জামানের ভয়ও কমে এসেছে। কিছুক্ষণ আগে একটি শেয়াল এসে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বেশ শব্দ করেই বলেছে–'যাহ্ যাহ্।' এই শিয়ালটি আবার এসেছে। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। টকটকে লাল চোখ নিয়ে বদিউজ্জামান তাকিয়ে আছে শেয়ালটির দিকে। তার ভালোই লাগছে। গিরগিটিটি দুপুরের পর থেকেই নেই। বদিউজ্জামানের খুব নিঃসঙ্গ লাগছিল। এখন আর লাগছে না।

মাগরেবের নামাজ আদায় করতে চার-পাঁচজন মুসল্লি গিয়েছিল মসজিদে। আজানের পরপরই কয়েকটি গুলির শব্দ হওয়ায় তারা নামাজ আদায় না করেই ফিরে এল। ফেরার পথে তাদের মনে হলো, কাজটা ঠিক হলো না। এতে আল্লাহর গজব পড়ার সম্ভাবনা। তারা আবার মসজিদে ফিরে গেল। নামাজ পড়ল। মসজিদ থেকে বেরুবার সময় দেখল, রাস্তায় মিলিটারি। তারা আবার মসজিদে ফিরে গেল। রাত কাটাল সেখানেই।

সন্ধ্যার পর গ্রামের কোথাও কোনো বাতি জ্বলল না। চারদিকে অন্ধকার। সবাই বসে রইল। কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু কৈবর্তপাড়ায় কে যেন সুর করে কাঁদছে। সেই সুরেলা কান্না ভেসে আসছে অনেকদূর পর্যন্ত। চিত্রা বুড়ি বসে আছে কৈবর্তপাড়ায়। তাকে কেউ কিছু বলছে না। চিত্রা বুড়িও কাঁদছে। হাউমাউ কান্না।

বলাই কোনোখানেই বেশিক্ষণ থাকতে পারছে না। সারাক্ষণই তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তাকে ধরতে আসছে। সে অল্পকিছু সময়ের মধ্যেই বেশ কয়েকবার জায়গা বদল করল। বেশি দূর কখনো গেল না। সেনবাড়ি। সেনবাড়ির মন্দির। এর মধ্যেই তার ঘোরাফেরা। সন্ধ্যা মেলাবার পর সে চিলেকোঠার লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল। ছাদে আধহাতের মতো পানি জমে আছে। সে বসে রইল পানির মধ্যে। কিছুক্ষণ তার ভালোই কাটল। তারপরই মনে হতে লাগল লোহার সিঁড়িতে যেন শব্দ হচ্ছে। মিলিটারিরা উঠে আসছে। সিঁড়ি কাঁপছে। তারপর আবার সব চুপচাপ। কেউ আসেনি–মনের ভুল।

২০২৩

বলাইয়ের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেল। আবার মনে হলো, কেউ আসছে। সিঁড়ি কাঁপছে। বলাই দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

ঝড়ের সময় একজন মিলিটারি সুবাদার ও তিনজন রাজাকারের একটি দল ছুটতে ছুটতে সফদরউল্লাহর চালাঘরে এসে উঠেছিল। সফদরউল্লাহ বাড়িতে ছিল না। মেয়েছেলেদের গ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে নেবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না এ নিয়ে সে আলাপ করতে গিয়েছিল জয়নাল মিয়ার সঙ্গে।

ওরা সফদরউল্লাহর ঘরে ঢুকেই টর্চ টিপল। সেই টর্চের আলো পড়ল জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা সফদরউল্লাহর স্ত্রী ও তার ছোট বোনের মুখে। ছোট বোনটির বয়স বারো। মিলিটারি সুবাদার মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, এরকম সুন্দর মেয়ে সে কাশ্মিরেই শুধু দেখেছে, বাঙালিদের মধ্যে এরকম সুন্দর দেখেনি। সে খুবই সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। ঝড়ের জন্য এই দুবোনের চিৎকার কেউ শুনতে পেল না।

মেয়েদের গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে জয়নাল মিয়ার অভিমত হলো—এর কোনো দরকার নাই। হিন্দু মেয়ের কিছুটা ভয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমান মেয়েদের কোনো ভয় নাই। জয়নাল মিয়া দৃঢ়স্বরে বললেন, 'মুসলমানদের শইলে এরা হাত দেয় না। এই গ্রামে যে তিনটা মানুষ মারা গেছে, এর মধ্যে মুসলমান কেউ আছে? কও তোমরা, আছে?'

কথা খুবই সত্যি। জয়নাল মিয়া নিচুস্বরে বলল, 'মুসলমানের সঙ্গে ব্যবহারও খুব বালা। মীর আলি চাচারে মেজর সাব সালাম দিছে। বিশ্বাস না হইলে জিগাইয়া আও।'

এই কথাটিও সত্যি। তবু মতি বলল, 'ঘরের মেয়েছেলেরা বড় অস্থির হইয়া পড়ছে।' জয়নাল মিয়া দৃঢ়স্বরে বলল, রাইত দুপুরে এভাবে টানাটানি করার কোনো দরকার নাই। যাও, তোমরা বাড়িত গিয়া আল্লাহ খোদার নাম নেও। ফি আমানিল্লাহ্। ভয়ের কিছু নাই।

যে অল্প কজন এসেছিল তারা ঝড়ের মধ্যেই চলে গেল। ঝড় থামবার পর জয়নাল মিয়ার কাছে খবর এলো—মেজর সাহেব তার সঙ্গে দেখা করতে চান। সে যেন দেরি না করে। জয়নাল মিয়া ভীতস্বরে বলল, 'যাও, গিয়া বলো, আমি আসতাছি।' বাঙালি রাজাকারটি বিরক্ত মুখে বলল, 'আমার সাথে চলেন। সাথে যাইতে বলছে।'
সফদরউল্লাহর বাড়ির সামনে এসে জয়নাল মিয়ার মনে হলো ভেতর বাড়িতে মেয়েছেলে কাঁদছে। সফদরউল্লাহ উঠানে বসে আছে। জয়নাল মিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে?' সফদরউল্লাহ জবাব দিলো না?
'কান্দে কে?'
সফদরউল্লাহ সেই প্রশ্নেরও জবাব দিলো না। সঙ্গের রাজাকারটি জয়নাল মিয়ার পিঠে ঠেলা দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি হাঁটেন।'

১৩

মেজর সাহেব এক মগ কফি হাতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সমস্ত গা ভেজা। মাথায় টুপি নেই। ভেজা চুল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াল। ইমাম সাহেব বসেই রইলেন। তাঁর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কিছু সময় পরপরই তাঁর বমি হচ্ছে। ঘরময় বমির কটু গন্ধ। রফিক একটি হারিকেন টেবিলের ওপর রেখে চেয়ার এগিয়ে দিলো মেজর সাহেবের দিকে।

তিনি বসলেন না। একটি পা রাখলেন চেয়ারে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। প্রশ্নগুলো ইমাম সাহেবের প্রতি। রফিককে প্রতিটি প্রশ্ন ও উত্তর ইংরেজি করে দিতে হচ্ছিল। প্রশ্নোত্তর পর্বের গতি হলো শ্লথ, সেজন্য মেজর সাহেবের কোনো ধৈর্যচ্যুতি হলো না।

'তারপর, ইমাম ভালো আছ?'

'জি।'

'আমি তো খবর পেলাম ভালো নেই। ক্রমাগত বমি হচ্ছে।'

'জি হুজুর।'

'শাস্তির দৃশ্যটা ভালো লাগে নি?'

ইমাম সাহেব জবাব দিলেন না। বমির বেগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মেজর সাহেবের মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল।

'দৃশ্যটি কি খুব কঠিন ছিল?'

'জি।'

'তুমি নিজে নিশ্চয়ই গরু-ছাগল জবাই কর। কর না?'

'জি করি।'

'তখন খারাপ লাগে না?'

ইমাম সাহেব একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। মেজর সাহেব কফির মগে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। জবাব পাওয়া গেল না।

'ইমাম!'

'জি স্যার!'

'এখন আমাকে বলো, তোমাদের ঐ জঙ্গলে মোট কতজন বাঙালি সৈন্য আছে?'

'আমি জানি না স্যার।'

'সঠিক সংখ্যাটি না বলতে পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। অনুমান করে বলো।'

'আমি জানি না স্যার।'

'সৈন্য আছে কি না সেটা বলো।'

'স্যার, আমি জানি না।'

'আচ্ছা বেশ, সৈন্য নেই, এই কথাটিই তোমার মুখ থেকে শুনি।'

'স্যার, আমি জানি না। কিছুই জানি না স্যার।'

মেজর সাহেব কফির মগ নামিয়ে রাখলেন। সিগারেট ধরালেন। তার কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল।

'তুমি কখনো ঐ বনে যাওনি?'

'জি না স্যার। আমি ধর্মকর্ম নিয়ে থাকি।'

'ধর্মকর্ম নিয়ে থাক?'

'জি স্যার।'
'মসজিদে লোক হয়?'
'হয় স্যার।'
'সেখানে তুমি কি পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করো?'
ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। মেজর সাহেবের কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ল।
'খুতবার শেষে পাকিস্তানের জন্যে কখনো দোয়া করোনি?'
'পৃথিবীর সব মুসলমানের জন্য দোয়া-খায়ের করা হয় স্যার।'
'তুমি আমার কথার জবাব দাও। পাকিস্তানের জন্য দোয়া করোনি?'
'জি না স্যার।'
'বাংলাদেশের জন্যে কখনো দোয়া করেছ?'

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। মেজর সাহেব হঠাৎ প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গেলেন। রফিক তাঁকে উঠে বসাল। মেজর সাহেব ঠাণ্ডাস্বরে বললেন, 'ব্যথা লেগেছে?'
'জি না।'
'এতটুকু ব্যথা লাগেনি?'
'জি না স্যার।'
'আমার হাত এতটা কমজোরি তা জানা ছিল না।'

মেজর সাহেব হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় চড়টি দিলেন। ইমাম সাহেব গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলেন। তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল। রফিক তাঁকে তুলতে গেল। মেজর সাহেব বললেন, 'ও নিজে নিজেই উঠবে। ইমাম উঠে বসো।' ইমাম সাহেব উঠে বসলেন।
'এখন বলো, তুমি শেখ মুজিবর রহমানের নাম শুনেছ?'
'জি শুনেছি।'
'সে কে?'
ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন।
'সে কে তুমি জানো না?'

মেজর সাহেব এগিয়ে এসে তৃতীয় চড়টি বসালেন। ইমাম সাহেব শব্দ করে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। মেজর সাহেব তাকালেন আজিজ মাস্টারের দিকে।

'তারপর কবি, তুমি কেমন আছ? ভালো আছ?'
'জি।'
'তুমি শুনলাম বেশ শক্তই ছিলে। বমি-টমি কিছু করোনি?'
আজিজ মাস্টার জবাব দিলো না।
'বাংলাদেশের উপর কখনো কবিতা লিখেছ?'
'জি না স্যার।'
'কেন, লেখো নি কেন?'
আজিজ মাস্টার চুপ করে রইল।

'শেখ মুজিবের উপর লিখেছ?'
'জি না।'
আজিজ মাস্টারের পা কাঁপতে লাগল। মেজর সাহেব বললেন, 'তুমি প্রেমের কবিতা ছাড়া অন্যকিছু লেখো না?'
'জি না।'
'তুমি দেখি দারুণ প্রেমিক মানুষ। সব কবিতা কি মালা নামের ঐ বালিকাকে নিয়ে লেখা? জবাব দাও। বলো হ্যাঁ কিংবা না।'
'হ্যাঁ।'
'শোনো আজিজ, আমি কথা রাখি। আমি কথা দিয়েছিলাম ঐ মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব। সেটা আমার মনে আছে। আমি ঐ মেয়ের বাবাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। এখন তুমি আমাকে বলো–ঐ বনে কতজন সৈন্য লুকিয়ে আছে?'
'স্যার, বিশ্বাস করেন, আমি কিছুই জানি না।'
'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না। তুমি বোধহয় জানো না আমি কী পরিমাণ নিষ্ঠুর হতে পারি। তুমি জানো?'
'জি স্যার, জানি।'
'না, তুমি জানো না। তবে এক্ষুনি দেখতে পাবে। রফিক, তুমি ওর জামাকাপড় খুলে ওকে নেংটো করে ফেলো।'

আজিজ মাস্টার হতভম্ব হয়ে তাকাল। এই লোকটা বলে কী? আজিজ মাস্টারের পা কাঁপতে লাগল। মেজর সাহেব বললেন, দেরি করবে না, আমার হাতে সময় বেশি নেই। রফিক!'
'জি স্যার।'
'এই মিথ্যাবাদী কুকুরটাকে নেংটা করে সমস্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখাবে। বুঝতে পারছ?'
'পারছি।'
'আর শোনো, একটা ইটের টুকরো ওর পুরুষাঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে। এতে সমস্ত ব্যাপারটায় একটা হিউমার আসবে।'
'আজিজ মাস্টার কাঁপা গলায় বলল, আমি কিছুই জানি না, স্যার। একটা কোরান শরিফ দেন, কোরান শরিফ ছুঁয়ে বলব।'
'তার কোনো প্রয়োজন দেখি না। রফিক! যা করতে বলছি, করো।'
রফিক থেমে থেমে বলল, 'মানুষকে এভাবে লজ্জা দেবার কোনো অর্থ হয় না।' মেজর সাহেবের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হতে লাগল। তিনি তাকিয়ে আছেন রফিকের দিকে। রফিক বলল, 'আপনি যদি একে অপরাধী মনে করেন তাহলে মেরে ফেলেন। লজ্জা দেবার দরকার কী?'
'তুমি একে অপরাধী মনে করো না?'
'না। আমার মনে হয় সে কিছু জানে না।'
'সে এই গ্রামে থাকে, আর এতবড় একটা ব্যাপার জানবে না?'
'জানলে বলত। কিছু জানে না, তাই বলছে না।'
'বলবে সে ঠিকই। ইট বেঁধে তাকে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাও–দেখবে তার মুখে কথা ফুটেছে। তখন সে প্রচুর কথা বলবে।'
রফিক ঠান্ডা স্বরে বলল, 'স্যার, ওকে এরকম লজ্জা দেওয়াটা ঠিক না।'
'কেন ঠিক না?'

'আপনি শুধু ওকে লজ্জা দিচ্ছেন না, আপনি আমাকেও লজ্জা দিচ্ছেন। আমিও ওর মতো বাঙালি।'
'তাই নাকি। আমি তো জানতাম তুমি পাকিস্তানি। তুমি কি সত্যি পাকিস্তানি?'
'জি স্যার।'
'আমার মনে হয় এটা তোমার সবসময় মনে থাকে না। মনে রাখবে।'
'জি স্যার, রাখব।'
'এটা তোমার নিজের স্বার্থেই মনে রাখা উচিত।'

রফিক চুপ করে গেল। মেজর সাহেব বললেন, 'একটা মজার ব্যাপার কি জানো রফিক? তুমি যদি আজিজ মাস্টারকে চয়েস দাও মৃত্যু অথবা লজ্জাজনক শাস্তি, তাহলে সে লজ্জাজনক শাস্তিটাই বেছে নেবে। মহানন্দে পুরুষাঙ্গে ইট বেঁধে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াবে। জিজ্ঞেস করে দেখো।' রফিক কিছুই জিজ্ঞেস করল না। মেজর সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, 'আজিজ, পরিষ্কার উত্তর দাও। মরতে চাও, না চাও না? আমি দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করব না। ত্রিশ সেকেন্ডের ভেতরে জবাব চাই। বলো মরতে চাও, না চাও
না?'
'মরতে চাই না।'
মেজর সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'বেশ, তাহলে কাপড় খুলে ফেলো। তোমাকে ঠিক এক মিনিট সময় দেওয়া হলো তার জন্য।' আজিজ মাস্টার কাপড় খুলতে শুরু করল।
'রফিক, আমার কথা বিশ্বাস হলো?'
'হলো।'
'বাঙালিদের মান-অপমান বলে কিছু নেই। একটা কুকুরেরও আত্মসম্মান থাকে, এদের তাও নেই। আমি যদি ওকে বলি, যাও, ঐ ইমামের পশ্চাদ্দেশ চেটে আসো ও তাই করবে।'
রফিক মৃদুস্বরে বলল, 'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে অনেকেই এরকম করবে।'
'তুমি করবে?'
'জানি না। করতেও পারি। মৃত্যু একটা ভয়াবহ ব্যাপার। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কে কী করবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়।'
'তাই বুঝি?'
'জি স্যার। আপনার মতো একজন সাহসী মানুষও দেখা যাবে কাপুরুষের মতো কাণ্ডকারখানা করছে।'

মেজর সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এবং তারও মিনিটখানেক পর জয়নাল মিয়াকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। আজিজ মাস্টার দুহাতে তার লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করল। ইমাম সাহেব বেশ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'জয়নাল মিয়া, ভালো আছেন?'

জয়নাল কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল–বলতে পারল না। আজিজ মাস্টারের মতো একজন বয়স্ক মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে–এটি এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ইমাম সাহেব বললেন, 'বড় খারাপ সময় জয়নাল সাব, আল্লাহ খোদার নাম নেন।'

জয়নাল মিয়া আবারও কিছু বলতে চেষ্টা করল। বলতে পারল না। কথা আটকে গেল।

রফিক শান্তস্বরে বলল, 'জয়নাল সাহেব, আপনি বসেন। স্যার যা যা জিজ্ঞেস করবেন তার সত্যি জবাব দিবেন। বুঝতেই পারছেন।' জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে পড়ল। ইমাম সাহেব বললেন, 'চেয়ারে বসেন, মাটিতে প্রস্রাব আছে নাপাক জায়গা।'

১৪

মেঘ নেই।

আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

রাত প্রায় আটটা, কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। হাওয়া থেমে গেছে। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। সফদরউল্লাহ একটা দা হাতে মাঠে নেমে পড়ল। সে দুজনকে খুঁজছে। একজন তালগাছের মতো লম্বা। গোঁফ আছে। অন্যজন বাঙালি, তার মুখে বসন্তের দাগ। সফদরউল্লাহ কোনো রকম শব্দ না করে হাঁটছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। সে যেভাবে হাঁটছে তাতে মনে হয় অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে। কোনো কোনো সময় মানুষের ইন্দ্রিয় অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

সে প্রথমে গেল বিলের দিকে। কেউ নেই সেখানে। বেশকিছু কাটা ডাব পড়ে আছে চারদিকে। সফদরউল্লাহ দীর্ঘ সময় বিলের পাড়ে দা হাতে বসে রইল। বাতাস নেই কোথাও, তবু বিলের পানিতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। ওরা আবার হয়তো আসবে। পানিতে দাঁড় করিয়ে আরও মানুষ মারবে। সফদরউল্লাহর মনে হলো কেউ একজন যেন এদিকে আসছে। সে শক্ত করে দাটি ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'কেডা?'
'আমি নিজাম। আপনে কী করেন?'
'কিছু করি না।'
'অন্ধকারে বইয়া আছেন ক্যান?'
সফদরউল্লাহ ফুঁপিয়ে উঠল। নিজাম বলল, 'সব মিলিটারি জমা হইতেছে জঙ্গলা মাঠে, দেখবেন?' সফদরউল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।
'হাতে দাও ক্যান?'
'আছে, কাম আছে। দাওয়ের কাম আছে।'

কৈবর্তপাড়া খালি হয়ে যাচ্ছে।

এরা সরে পড়ছে নিঃশব্দে। এদের অভ্যাস আছে–অতি দ্রুত সবকিছু গুছিয়ে সরে পড়তে পারে। অন্ধকারে এরা কাজ করে। ওদের শিশুরা চোখ বড় বড় করে দেখে, হইচই করে না, কিছুই করে না। মেয়েরা জিনিসপত্র নৌকায় তুলতে থাকে। কোনো জিনিসই বাদ পড়ে না। হাঁস, মুরগি, ছাগল–সবই উঠানো হয়। এরা কাজ করে নিঃশব্দে। প্রবীণরা হুঁকো হাতে বেশ অনেকটা দূরে বসে থাকে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় কী হচ্ছে না হচ্ছে এরা কিছুই জানে না। এরা ঝিমুতে থাকে। ঝিমুতে ঝিমুতেই চারদিকে লক্ষ রাখে। বুড়ো বয়সেও এদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

মীর আলি খুনখুন করে কাঁদে।
ভাতের জন্য কাঁদে। বদিউজ্জামান বাড়ি ফেরেনি। সে না ফেরা পর্যন্ত অনুফা ভাত চড়াবে না। ঘরে চাল-ডাল সবই আছে। চারটা চাল ফুটাতে এমন কী ঝামেলা মীর আলি বুঝতে পারে না। অনেক রকম ঝামেলা আছে ঠিকই–মাথার উপর টিনের ছাদ নেই। গ্রামে মিলিটারি মানুষ মারছে। তাই বলে মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো চলে যায়নি? পরীবানুও বিরক্ত করছে না। ঘুমাচ্ছে। অসুবিধা তো কিছু নেই।
মীর আলি মৃদুস্বরে বলল, 'বৌ, চাইরডা ভাত রাইন্ধা ফেল।' অনুফা তীব্র স্বরে বলল, 'আপনে মানুষ, না আর কিছু?'
মীর আলি অবাক হয়ে বলে, 'আমি কী করলাম?'

পনেরো-বিশজন সেপাই বসে আছে স্কুলের বারান্দায়। এরাও ক্ষুধার্ত। সমস্ত দিন কোনো খাওয়া হয়নি। ওদের জন্য রান্না হবার কথা মধুবনে। ঝড়ের জন্য নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা হয়েছে। রান্না করা খাবার এসে পৌঁছায়নি। কখন এসে পৌঁছাবে কে জানে! এরা সবাই দেয়ালে ঠেস দিয়ে শ্রান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। কয়েকজন স্পষ্টতই ঘুমাচ্ছে। কিছু বাঙালি রাজাকার ওদের সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করছে। গল্প জমছে না। ওরা হাল ছাড়ছে না, 'ওস্তাদজি' 'ওস্তাদজি' বলেই যাচ্ছে।

বদিউজ্জামানের মনে হলো জ্বর এসেছে। সে নিশ্চিত হতে পারছে না। মাথায় হাত দিলে কোনো উত্তাপ পাওয়া যায় না। কিন্তু তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। কিছুক্ষণ আগেও তার শীত ক ছিল। এখন আর করছে না। খুকখুক করে কে যেন কাশল। নাকি সে নিজেই কাশছে? নিজামের মতো তারও মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একবার মনে হলো, শীতল ও লম্বা একটা কী যেন তার শার্টের ভেতর ঢুকে গেছে। সে প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু চিৎকার করল না। মনের ভুল। শার্টের ভেতর কিছুই নেই। বদিউজ্জামানের মনে হলো, সে যেন অনেকের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। কথাবার্তা বলতে বলতে কারা যেন এগিয়ে আসছে। এটাও কি মনের ভুল? বদিউজ্জামান উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সে ঠিক করে রাখল, মিলিটারিরা তাকে মেরে ফেললে সে বলবে–ভাইয়েরা, কেমন আছেন? বড় মজার ব্যাপার হবে। বদিউজ্জামান নিজের মনে খুকখুক করে হাসতে লাগল। বাঁ দিকে চারটি সবুজ চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে–শেয়াল। দিনে যে শেয়ালটা তাকে দেখে গিয়েছিল সে নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ভাবতে বেশ মজা লাগল বদিউজ্জামানের। সে আবার হাসতে শুরু করল। এবার আর নিজের মনে হাসা নয়, শব্দ করে হাসা।

১৫

রফিক বাইরে এসে দেখল, মেজর সাহেব স্কুলঘরের শেষ প্রান্তের বারান্দায় একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। রফিককে দেখে তিনি কিছুই বললেন না। রফিক বারান্দায় নেমে গেল। অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ, তারপর হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। মেজর সাহেব ভারী গলায় ডাকলেন, 'রফিক!'

'রফিক ফিরে এল।'

'কোথায় যাচ্ছিলে?'

'তেমন কোথাও না।'

'তোমাকে একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি।'

'বলুন।'

'তুমি কি জানো আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না?'

'জানি।'

'কখন থেকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি জানো?'

'শুরু থেকেই। কোনো বাঙালিকেই আপনি বিশ্বাস করেন না।'

'তা ঠিক। যারা বিশ্বাস করেছে সবাই মারা পড়েছে। আমার বন্ধু মেজর বখতিয়ার বিশ্বাস করেছিল। ওরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

'মেজর বখতিয়ার বিশ্বাস করেছিল কী করেনি সেটা আপনি জানেন না। অনুমান করছেন।'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক। আমি জানি না।'

মেজর সাহেব হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ঐ মাস্টারটির বিশেষ অঙ্গে ইট ঝুলিয়ে

দিয়েছ?'

'না।'

'কেন? প্রমাণ সাইজের ইট পাওনি?'

রফিক কথা বলল না। মেজর সাহেব চাপাস্বরে বললেন, 'বাঙালি ভাইদের প্রতি দরদ উথলে উঠেছে?'

'আমার মধ্যে দরদ-টরদ কিছু নাই মেজর সাহেব। ইট ঝুলানোটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।'

'মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়। আমি ইট-বাঁধা অবস্থায় ওকে ওর প্রেমিকার কাছে নিয়ে যাব। এবং ওকে বলব সেই প্রেমের কবিতাটি আবৃত্তি করতে।'

'কেন?'

'রফিক!'

'জি স্যার।'

'তুমি আমাকে প্রশ্ন করার দুঃসাহস কোথায় পেলে?'

'আপনি একজন সাহসী মানুষ। সাহসী মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে আমিও সাহসী হয়ে উঠেছি।'

'আই সি।'

'এবং স্যার, আপনি একবার আমাকে বলেছিলেন, আমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা বলে ফেলতে।'

'বলেছিলাম?'

'জি স্যার।'

'সেই প্রিভিলেজ এখন আর তোমাকে দিতে চাই না। এখন থেকে তুমি কোনো প্রশ্ন করবে না।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'রফিক!'

'জি স্যার।'

'আজ তোমাকে অস্বাভাবিক রকম উৎফুল্ল লাগছে।'

'আপনি ভুল করছেন, স্যার। আমাকে উৎফুল্ল দেখানোর কোনো কারণ নেই। এমন কিছুই ঘটেনি যে আমি উৎফুল্ল হব।'

'তুমি বলতে চাও যে বিমর্ষ হবার মতো অনেক কিছু ঘটেছে?'

'আমি তাও বলতে চাই না।'

মেজর সাহেব পশতু ভাষায় কী যেন বললেন। কোনো কবিতা-টবিতা হবে হয়তো। রফিক তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বললেন, 'রফিক, তুমি পশতু জানো?'

'জি না, স্যার।'

'না চাইলেও শোনো। এর মানে হচ্ছে, বেশি রকম বুদ্ধিমানের মাঝে মাঝে বড় রকম বোকামি করতে হয়।'

রফিক কিছুই বলল না। মেজর সাহেব বললেন, 'চলো, জয়নাল লোকটির কাছ থেকে কিছু জানতে চেষ্টা করি। তোমার কি মনে হয় ও আমাদের কিছু বলবে?'

'না স্যার, বলবে না।'

'কী করে বুঝলে?'

'এরা কিছুই জানে না। কাজেই কিছু বলার প্রশ্ন ওঠে না।'

'চলো দেখা যাক।'

'তোমার নাম জয়নাল?'
'জি।'
'এই নেংটা মানুষটাকে তুমি চেন?'
'জি স্যার।'
'ও তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।'
জয়নাল মিয়া হতভম্ভ হয়ে তাকাল।
তার পা কাঁপতে লাগল–এসব কী শুনছে?
ইমাম সাহেব অস্ফুট একটি ধ্বনি করলেন। মেজর সাহেব বললেন, 'কিছু বলবে ইমাম?'
'জি না স্যার।'
'জয়নাল, তুমি কিছু বলবে?'
'জি না।'
'আমি ঠিক করেছি মাস্টারকে এই অবস্থায় তোমার মেয়ের কাছে নিয়ে যাব। জয়নাল, তোমার মেয়েটি কি বাড়িতে আছে?'
জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে পড়ল। মেজর সাহেব হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন, যেন কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। ঘরে একটি শব্দও হলো না।
'জয়নাল!'
'জি।'
'তোমার মেয়েটি বাড়িতেই আছে আশা করি।'

জয়নাল মিয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মেজর সাহেব প্রচন্ড ধমক দিলেন 'কান্না বন্ধ করো। কান্না আমার সহ্য হয় না। চলো যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলো চলো।'

আজিজ মাস্টার তখন কথা বলল। অত্যন্ত স্পষ্টস্বরে বলল, 'মেজর সাহেব, আমি মরবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান।'
মেজর সাহেব মনে হলো বেশ অবাক হলেন। কৌতূহলী গলায় বললেন, 'মরতে রাজি আছ?'
'হ্যাঁ।'
'ভয় লাগছে না?'
'লাগছে।'
'তবু মরতে চাও?'

আজিজ মাস্টার জবাব না দিয়ে নিচু হয়ে তার পাজামা তুলে পরতে শুরু করল। মেজর সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগলেন। কিছুই বললেন না।

আজিজ মাস্টারকে তার প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে রাজাকাররা নিয়ে গেল বিলের দিকে। আজিজ মাস্টার বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে গেল। যাবার আগে ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্লামালিকুম।' ইমাম সাহেব বা জয়নাল মিয়া কেউ কিছু বলল না।

আজিজ মাস্টার চলে যাবার পর দীর্ঘ সময় কেউ কোনো কথা বলল না। মেজর সাহেব গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। জয়নাল মিয়া কাঁপতে লাগল থরথর করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুলঘরের পেছনে কয়েকটি গুলির শব্দ হলো। ইমাম সাহেব ক্রমাগত দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন।

মেজর সাহেব বললেন, 'জয়নাল, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও। আমাকে রাগিও না। বলো, মোট কতজন সৈন্য লুকিয়ে আছে তোমাদের জঙ্গলা মাঠে? মনে রাখবে আমি একই প্রশ্ন দুবার করব না। বলো, কতজন?'

'প্রায় একশ।'

ইমাম সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকালেন। রফিক অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপতে লাগল।

'এরা কবে এসেছে এই বনে?'

'পরশু।'

'এই গ্রাম থেকে তোমরা কবার খাবার পাঠিয়েছ?'

'তিনবার।'

'আজিজ মাস্টার এবং ইমাম–এরা এ খবর জানে?'

'জি না, এরা বিদেশি মানুষ। এদের কেউ বলে নাই।'

'ঐ সৈন্যরা এখান থেকে কোথায় যাবে জানো?'

'জি না।'

'কেউ জানে?'

'জি না।'

'ওদের মধ্যে কতজন অফিসার আছে?'

'আমি জানি না।'

'ওদের সঙ্গে গোলাবারুদ কী পরিমাণ আছে?'

'জানি না স্যার।'

'ওদের মধ্যে আহত কেউ আছে?'

'আছে।'

'কতজন?'

'ছয়-সাতজন।'

'ওরাও বনেই আছে?'

'জি না।'

'ওরা কোথায়?'

'কৈবর্তপাড়ায়। জেলে পাড়ায়।'

'বনে খাবার নিয়ে কারা যেত?'

'কৈবর্তরা।'

মেজর সাহেব থামলেন। জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে হাঁপাতে লাগল। রফিক এখনো জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

'জি স্যার।'

'তুমি যাও। তোমাকে যেতে বললাম।'

জয়নাল মিয়া নড়ল না। উবু হয়ে বসে রইল। মেজর সাহেব বললেন, 'নাকি যেতে চাও না?'

'যেতে চাই।'

'তাহলে যাও। দৌড়াও। আমি মত বদলে ফেলবার আগেই দৌড়াও।'
জয়নাল মিয়া উঠে দাঁড়াল। নিচুগলায় বলল, 'স্যার স্লামালিকুম।'
মেজর সাহেব বললেন, 'ইমাম, তুমি যাও।'
ইমাম সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।
'যাও, যাও। চলে যাও। কুইক।'

ওরা ঘর থেকে বেরুল। স্কুল গেট পার হয়েই ছুটতে শুরু করল। মেজর সাহেব জানালা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।
'রফিক!'
'জি স্যার?'
'জয়নাল কি সত্যি কথা বলল?'
'মনে হয় না স্যার। প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনেক সময় এ জাতীয় কথা বলা হয়।'
'কিন্তু আমি জানি ও সত্যি কথাই বলেছে।'
রফিক চুপ করে রইল।
'এবং আমার মনে হচ্ছে তুমিও তা জানো।'
রফিক তাকাল জানালার দিকে। বাইরে ঘন অন্ধকার।
'আমার মনে হয় তুমি আরও অনেক কিছুই জানো।'
'আমি তেমন কিছু জানি না।'
'তুমি শুধু বলো, তোমাদের সৈন্যরা এখনো কি বনে লুকিয়ে আছে?'
'আমি কী করে জানব?'
'তুমি অনেক কিছুই জানো। আমি কৈবর্তপাড়ায় তল্লাশি করতে চেয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে–প্রয়োজন নেই।'
'আমার ভুল হয়েছিল। সবাই ভুল করে।'
'ঝড়ের সময় একটা পাগল ছুটে গেল বনের ভেতর। যায়নি?'
'হ্যাঁ।'
'ওকে বনের ভেতর যেতে দেখে তুমি উল্লসিত হয়ে উঠলে।'
রফিক একটি নিঃশ্বাস ফেলল।
'বলো, তুমি উল্লসিত হওনি?'
'ভুল দেখেছেন স্যার।'
'আমার ধারণা, ঐ পাগলটি বনে খবর নিয়ে গেছে। এবং সবাই পালিয়েছে ঝড়ের সময়।'
মেজর সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন কণ্ঠে বললেন, চলো আমার সঙ্গে।'
'কোথায়?'
'বুঝতে পারছ না কোথায়? তুমি তো বুদ্ধিমান। তোমার তো বুঝতে পারা উচিত। বলো, বুঝতে পারছ?'
'পারছি।'
'ভয় লাগছে?'
'না!'
'ওরা কি ঝড়ের সময় পালিয়েছে?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণে ওরা অনেকদূর চলে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি মধুবনের দিকে গেলে হয়তো এখনো ওদের ধরা যাবে।'
'তুমি আবার আমাকে কনফিউজ করতে চেষ্টা করছ। এরা হয়তো বনেই বসে আছে।'
রফিক মৃদু হাসল।
'বলো, ওরা কি বনে বসে আছে?'
'হয়তো আছে। গভীর রাতে বের হয়ে আসবে।'
'ঠিক করে বলো।'
'আপনি এখন আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করবেন না। কাজেই কেন শুধু শুধু প্রশ্ন করছেন?'

কৈবর্তপাড়ায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। চিত্রা বুড়ি অবাক হয়ে আগুন দেখছে। রাজাকাররা ছোটাছুটি করছে। তাদের ছোটাছুটি দেখে মনে হয় খুব উৎসাহ বোধ করছে। আগুন জ্বালানোর জন্য তাদের যথেষ্ট খাটাখাটনি করতে হচ্ছে। ভেজা ঘরবাড়ি। আগুন সহজে ধরতে চায় না।

মীর আলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার করছে। সে চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু আগুন দেখতে পাচ্ছে। গ্রামের মানুষজন সব বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে।

১৬

মেজর এজাজ আহমেদ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাশে ডানদিকে, চাইনিজ রাইফেল হাতে দুজন জোয়ান এসে দাঁড়িয়েছে। রফিক নেমেছে বিলে।

বিলের পানি অসম্ভব ঠান্ডা। রফিক পানি কেটে এগুচ্ছে। কী যেন ঠেকল হাতে। মনার ছোট ভাই বিরু। উপুড় হয়ে ভাসছে। যেন ভয় পেয়ে কাছে এগিয়ে আসতে চায়। রফিক পরম স্নেহে বিরুর গায়ে হাত রেখে বলল, 'ভয় নাই। ভয়ের কিছুই নাই।'

পাড়ে বসে থাকা মেজর সাহেব বললেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছ রফিক?'
'নিজের সঙ্গে মেজর সাহেব।'
'কী বলছ নিজেকে?'
'সাহস দিচ্ছি। আমি মানুষটা ভীতু।'
'রফিক!'
'বলুন।'
'ওরা কি বন ছেড়ে চলে গেছে? সত্যি করে বলো।'

রফিক বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। আচমকা হাসির শব্দে মেজর সাহেব চমকে উঠলেন।

কৈবর্তপাড়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আলো হয়ে উঠছে চারদিক। রফিককে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার। ছোটখাটো অসহায় একটা মানুষ বুকপানিতে দাঁড়িয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন, 'রফিক, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও?'
রফিক শান্তস্বরে বলল, 'চাই মেজর সাহেব। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। আপনি নিজেও চান। চান না?'

মেজর সাহেব চুপ করে রইলেন। রফিক তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'মেজর সাহেব, আমার কিন্তু মনে হয় না আপনি জীবিত ফিরে যাবেন এ দেশ থেকে।'

মেজর এজাজ আহমেদ সিগারেট ধরালেন, কৈবর্তপাড়ার আগুনের দিকে তাকালেন। পশতু ভাষায় সঙ্গের জোয়ান দুটিকে কী যেন বললেন। গুলির নির্দেশ হয়তো। রফিক বুঝতে পারল না। সে পশতু জানে না।

হ্যাঁ, গুলির নির্দেশই হবে। সৈন্য দুটি বন্দুক তুলছে। রফিক অপেক্ষা করতে লাগল।
বুক পর্যন্ত পানিতে গা ডুবিয়ে লালচে আগুনের আঁচে যে-রফিক দাঁড়িয়ে আছে মেজর এজাজ আহমেদ তাকে চিনতে পারলেন না। এ অন্য রফিক। মেজর এজাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।

- ০ -

শব্দার্থ ও টীকা

মনিহারী – কাগজ-কলম, খেলনা, কাচের চুড়ি, প্রসাধন সামগ্রী, শৌখিন জিনিস প্রভৃতি খুচরা দ্রব্য বিক্রি হয় এমন।

'বাইরে যাওন দরকার' – (এখানে) মূত্র-ত্যাগের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া।

ফসর-ফসর – 'ফসর' 'পসরা' শব্দের আঞ্চলিক রূপভেদ। আলো; কিরণ; প্রভা।

ওয়াক্ত – সময়কাল।

প্রহর – তিন ঘণ্টা ব্যাপী সময়। দিনের ২৪ ঘণ্টায় মোট আট প্রহর। 'রাতের দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়েছে' – রাত বারোটা পার হয়েছে।

'দুপুর-রাইতে' – মধ্য রাতে।

'মার্চটার্চ না' – সৈন্য সাধারণত যেভাবে কুচকাওয়াচ করে চলে, সেভাবে না।

মার্চ – সৈন্যদের কুচকাওয়াচ।

মার্চটার্চ – দ্বিরুক্ত রূপবিশেষ।

তারস্বরে – অতি উচ্চ আওয়াজে।

আছুইন – 'আছেন' শব্দের আঞ্চলিক রূপভেদ।

পুইয়ে যায় – শেষ হয়।

উজান দেশ – বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর, বিল ও নদীবেষ্টিত বিস্তীর্ণ এলাকা ভাটি অঞ্চল নামে পরিচিত। এখানে 'উজান দেশ' বলতে ভাটি অঞ্চলের বাইরের এলাকা বোঝানো হয়েছে।

নায়েব – জমিদারের স্থানীয় অফিসের প্রধান।

'যখ করে গেছেন' – 'যখ' 'যক্ষ' শব্দের বিবর্তিত রূপ। প্রচলিত কাহিনি মোতাবেক, ধনী কৃপণ ব্যক্তিরা তাদের ধন-সম্পদ পিতলের কলসিতে ভরে মাটির নিচের কুঠুরিতে রাখত, আর সম্পদ পাহারার জন্য একটি কম-বয়সী বালককে কুঠুরিতে আটকে রাখত। বালক মরে যখ হয়ে কুঠুরির ধন-সম্পদ পাহারা দেবে বলে তারা বিশ্বাস করত। এখানে লোকপ্রচলিত সে কাহিনিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

বিদেশি লোক – এখানে বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের লোক বোঝাচ্ছে। দেশের লোককে বিদেশি ভাবার মধ্য দিয়ে নীলগঞ্জ অঞ্চলের মানুষদের বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়।

কৈবর্ত – জেলে সম্প্রদায় বিশেষ।

জলমহাল – হাওর, বিল-ঝিল, নদী-নালা, খালসহ যেকোনো জলাভূমির মাছ আহরণের এলাকাকে জলমহাল বলা হয়।

দহ – জলাশয়ের গভীর অংশ।
'জোড়া পাঠা দিমু' – দেবীর উদ্দেশে এক জোড়া পাঠা বলি দেবে।
গণ্ডগ্রাম – ক্ষুদ্র গ্রাম।
চউক্ষের ধান্দা – চোখের ধাঁধা। দেখার ভুল।
আয়াতুল কুর্সি – কোরআনের সুরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত। ইসলামি বিশ্বাস মোতাবেক, এ আয়াত পড়ার বিশেষ ফজিলত আছে।
দোয়া ইউনুস – কোরআনের সুরা আম্বিয়ার ৮৭ নম্বর আয়াত। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, এ আয়াত পড়ার ফলে নবি ইউনুস মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এ কারণেই আয়াতটির এরকম নামকরণ হয়েছে।
ইয়া মুকাদ্দেমু – আল্লাহর গুণবাচক নিরানব্বই নামের একটি।
রজ্জুতে সর্পভ্রম – দড়িকে সাপ ভেবে ভুল করা।
নগদ বিদায় – নগদ টাকা দিয়ে বিদায়। এখানে 'উপরি আয়' বোঝানো হয়েছে।
হ্যাভারস্যাক – সৈন্যদের খাদ্য বহনের জন্য ব্যবহৃত ঝোলাবিশেষ। [ইংরেজি haver sack]।
সন্ন্যাসী – গৃহত্যাগী নিরাসক্ত মানুষ।
উত্তরবন্দে – গ্রামের উত্তরপার্শ্বস্থ ফসলের মাঠে।
সুন্নত – মুসলমান পুরুষের লিঙ্গত্বক ছেদ করার রীতি। জনভাষায় 'মুসলমানি' নামেও পরিচিত।
শরিফ আদমি – ভদ্রলোক।
ট্রানজিস্টার – একসময় রেডিওকে এ নামে ডাকা হতো।
খেলাপ – নড়চড়; ব্যতিক্রম; ব্যত্যয়; অন্যথা।
ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্ট – পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি সৈনিক নিয়ে গঠিত রেজিমেন্ট।
কম্পানি – দেড়-দুশ সৈন্যের একটি দল।
রাজাকার – আক্ষরিক অর্থ স্বেচ্ছাসেবক। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধে সহায়তার জন্য স্থানীয়দের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করে।
গিরগিটি – টিকটিকি জাতীয় একপ্রকার সরীসৃপ।
মরতবা – গুণ; সম্মান; মর্যাদা।
নন কমিশন্ড অফিসার – পদোন্নতি পেয়ে অফিসার হয়েছে এমন।
ইনস্টিংক্ট – সহজাত প্রবৃত্তি।
রুদ্রমূর্তি – ভয়ঙ্কর মূর্তি।
'পাসকোর্সে বিএ পাশ করেছি' – কোনো বিশেষ বিষয়ে অনার্সসহ বিএ পাশ করেনি এমন। ইন্টারমিডিয়েট পাশের পরে দুই বছরে এ ডিগ্রি করা যেত। এখন বাংলাদেশে এটা তিন বছরের ডিগ্রি। এ ডিগ্রিধারীদের সাধারণভাবে 'ডিগ্রিপাশ'ও বলা হয়।
কিংস্টোন ট্রিয়ো – উনিশশো ষাটের দশকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা আমেরিকার ফোক ও পপ সঙ্গীতের দল। The Kingston Trio.
চিলেকোঠা – ছাদের ছোট ঘরবিশেষ।
প্রিভিলেজ – বিশেষ সুবিধা। privilege.
পশতু ভাষা – পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে প্রচলিত ভাষাবিশেষ। পাঠানদের ভাষা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'নান্দাইল রোড' নামটি '১৯৭১' উপন্যাসে কোন ধরনের যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত?

ক. আকাশপথ
খ. নৌ-পথ
গ. রেলপথ
ঘ. সড়কপথ

২। '১৯৭১' উপন্যাসের পুরো ঘটনা সংঘটনে কত সময় লেগেছে?

ক. একদিন ও একরাত
খ. দুইরাত ও একদিন
গ. দুইরাত ও দুইদিন
ঘ. একরাত ও দুইদিন

৩। '১৯৭১' উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে–

ক. নীলগঞ্জ গ্রামকে কেন্দ্র করে
খ. মধুবন বাজারকে ঘিরে
গ. রুয়াইল বাজারকে ঘিরে
ঘ. নীলগঞ্জ গ্রাম ও জঙ্গলা মাঠকে কেন্দ্র করে

৪। মতি মিয়ার শালার নাম কী?

ক. বিরু
খ. নিজাম
গ. কলাই
ঘ. বদিউজ্জামান

৫। নীলগঞ্জে ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের কথিত অবস্থান জানার জন্য মেজর এজাজ স্কুলের আজিজ মাস্টারকে কী প্রস্তাব দিয়েছিল?

ক. চাকুরি স্থায়ী করে দেওয়ার
খ. নীলু সেনের বাড়ি দখল করে দেওয়ার
গ. জয়নাল মিয়ার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার
ঘ. জয়নাল মিয়ার বিষয় সম্পত্তি দখল করে দেওয়ার

৬। ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল বলে পাকিস্তানি বাহিনীর ধারণা?

ক. মধুবন বাজারে
খ. কৈবর্ত পাড়ায়
গ. নীলগঞ্জের স্কুলঘরে
ঘ. জঙ্গলা মাঠে

৭। বদিউজ্জামান ঊর্ধ্বশ্বাসে জঙ্গলা মাঠের দিকে ছুটেছিলো কেন?

ক. দ্বিতীয় মিলিটারি দলটিকে দেখে ভয় পেয়ে।
খ. ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের খবর দেওয়ার জন্য।
গ. ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের খাবার দেওয়ার জন্য।
ঘ. উপন্যাসের কাহিনি থেকে ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া যায় না।

৮। পাকিস্তানি মিলিটারিরা নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম ও স্কুলের আজিজ মাস্টারকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করেছিল কেন?

i. জয়নাল মিয়ার মেয়েকে তুলে আনার জন্য।
ii. এলাকার বাসিন্দাদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য।
iii. এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করার জন্য।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৯। হতদরিদ্র নীলগঞ্জের প্রথম ভিক্ষুক কে?

ক. চিত্রাবুড়ি খ. নিজাম

গ. বলাই ঘ. মনা কৈবর্ত

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০-১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

হরিমতি ও তার যুবতি মেয়ে সুমতি খান সেনাদের দেখে কাঁখ থেকে কলসি ফেলে দৌড় দেয়। আত্মরক্ষার জন্য তারা রাস্তার পাশের একটা স্কুল ঘরে আশ্রয় নেয়। ঘরে ঢুকে দম নেওয়ার আগেই তারা খান সেনাদের বুটের শব্দ শুনতে পায়। খানিকক্ষণ পর মা-মেয়ের আর্তনাদ ওঠে। পরে সব শান্ত হয়ে যায়। খান সেনারা মা-মেয়েকে হত্যা না করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে স্কুলঘর ছেড়ে চলে যায়।

১০। উদ্দীপকের হরিমতি ও সুমতি চরিত্রের সঙ্গে '১৯৭১' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র হলো–

ক. চিত্রাবুড়ি খ. মালা

গ. অনুফা ও পরীবানু ঘ. সফদরউল্লাহর স্ত্রী ও মেয়ে

১১। হরিমতি ও সুমতি চরিত্রের সঙ্গে এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–

i. তারা উভয়েই স্বাধীনতা যুদ্ধের সমসাময়িক।

ii. তারা উভয়েই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার।

iii. তারা উভয়েই কৃষিজীবী পরিবারের সদস্য।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২। অনুচ্ছেদের হরিমতি ও সুমতির সম্ভ্রমহানি '১৯৭১' উপন্যাসে উল্লেখিত ঘটনার কোন বাস্তবতাকে তুলে আনে?

ক. যুদ্ধের কৌশল খ. যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি

গ. যুদ্ধের ভয়াবহতা ঘ. যুদ্ধের মানবিক বিপর্যয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. এলাকায় ঢোকার পর খান সেনারা কলিমদ্দি দফাদারকে তাদের অভিযানের সঙ্গী করে নেয়। রোজ তিন টাকা বকশিশ এবং ইউনিয়ন বোর্ডের চাকুরি নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে সে নিখুঁত অভিনেতার মতো খান সেনাদের প্রতিটি অভিযানে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। এটা কলিমদ্দির বাইরের রূপ হলেও ভিতরে ভিতরে তিনি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক মানুষ। গোপনে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করতেন। খান সেনারা নতুন কোনো জায়গায় অভিযানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি আগেই তা মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়ে দিতেন। তার এরূপ ভূমিকার কারণে মুক্তিবাহিনী খান সেনাদের একটি দলকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। শুরুতে মানুষ ভুল বুঝলেও এ ঘটনার পর এলাকায় কলিমদ্দি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ক. নীলগঞ্জ গ্রামের অবস্থান কোথায়?

খ. মেজর এজাজ আজিজ মাস্টারকে প্রথম দিকে বিশেষ খাতির করে কেন?

গ. উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদার '১৯৭১' উপন্যাসে কোন চরিত্রের সঙ্গে এবং কেন সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "প্রকৃত দেশপ্রেমিকেরা লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশের জন্য তাদের সবটুকু উৎসর্গ করেন।"–উদ্দীপক ও '১৯৭১' উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক ঘটনা অবলম্বনে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

২. মিথ্যা চুরির অপরাধে কেরামত আলিকে ধরে নিয়ে যায় পঞ্চায়েতের লোকজন। তারা গঞ্জের হাটে প্রতিরাতের চুরির তথ্য জানতে চায় কেরামত আলির কাছ থেকে। নি পরাধ কেরামত আলি এর কিছুই জানে না বলে কোনো তথ্যও দিতে পারে না। ফলে তাকে বেধড়ক মারধরের শিকার হতে হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত প্রধান কেরামত আলিকে চুরির দায় স্বীকার করে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে। অন্যথায় তাকে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয়। জীবন বিপন্ন জেনেও কেবল মান-সম্মানের কথা বিবেচনা করে কেরামত আলি মিথ্যা চুরির দায় স্বীকার করে না। ফলে তাকে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

ক. নীলগঞ্জের কার বাড়িতে ট্রানজিস্টার আছে?

খ. মেজর এজাজ ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্টের কথিত দলটির প্রতি এতটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলো কেন?

গ. উদ্দীপকের কেরামত আলির সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে '১৯৭১' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? বর্ণনা করো।

ঘ. "মহৎ মানুষেরা জীবনের চেয়েও সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে অধিক মূল্যবান মনে করে।"– উদ্দীপক ও '১৯৭১' উপন্যাস অবলম্বনে এই মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করো।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। ক) সফদরউল্লাহর মানসিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করো।

খ) '১৯৭১' উপন্যাসে প্রতিফলিত নীলগঞ্জের জনজীবনের পরিচয় দাও।

২। ক) 'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে অনেকেই এরকম করবে।'– এ উক্তিটি কার? উক্তিটি করার কারণ কী ছিল? বুঝিয়ে লেখো।

খ) রফিক ও মেজরের সম্পর্কের টানাপড়েন কীভাবে কাহিনির গতিপথকে প্রভাবিত করেছে? তাদের মধ্যকার সংঘাতের কারণ ব্যাখ্যা করো।

৩। ক) আজিজ মাস্টারের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

খ) রফিক চরিত্রটি তোমার কাছে কি দ্বিমুখী চরিত্র মনে হয়? তোমার উত্তরের পক্ষে কারণ দেখাও।

৪। ক) মীর আলিকে মেজর এজাজ কেন সালাম দিলেন? ব্যাখ্যা করো।

খ) নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে যুদ্ধের বর্বরতা '১৯৭১' উপন্যাসে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো।

৫। ক) খুনের বিচার করতে মেজর এজাজ এতটা আগ্রহী হয়েছিল কেন?

খ) 'নীলগঞ্জ আসলে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।'– ব্যাখ্যা করো।

৬। ক) বদিউজ্জামান কাদের ভয়ে এবং কোথায় লুকিয়েছিল? তার অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

খ) 'অপমানের চেয়ে মানুষ মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে।'– আজিজ মাস্টারের উদাহরণ ব্যবহার করে বাক্যটির সত্যতা যাচাই করো।

৭। ক) অনুফা কে? সে কেন মীর আলির উপর বিরক্ত হয়?

খ) 'অকারণ নিপীড়নই একটি যুদ্ধকে জনগণের মুক্তিযুদ্ধে উপনীত করেছিল।'–'১৯৭১' উপন্যাস থেকে অন্তত তিনটি চরিত্রের উদাহরণ দিয়ে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো।

নাটক : ভূমিকা

ক. নাটকের ধারণা ও সংজ্ঞা

নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা। নাটক শব্দটির মধ্যেই নাটক কী, তার ইঙ্গিত রয়েছে। নাটক, নাট্য, নট, নটী— এই শব্দগুলোর মূল শব্দ হলো 'নট্'। নট্ মানে হচ্ছে নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা। নাটকের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Drama। Drama শব্দটি এসেছে গ্রিক Dracin শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো to do বা কোনো কিছু করা। নাটকের মধ্যেও আমরা মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নড়াচড়া, কথাবার্তা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোনো দিক বা ঘটনার উপস্থাপন দেখতে পাই। Online free dictionary-তে নাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- A prose or verse composition, especially one telling a serious story, that is intended for representation by actors impersonating the characters and performing the dialogue and action.

সাহিত্যের প্রাচীন রূপটিকে কাব্য বলা হতো। কাব্য ছিল দুই প্রকার—শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য কাব্য। তখন সাহিত্য প্রধানত পাঠ করে শোনানো হতো। আর যে কাব্য অভিনয় করে দেখানো হতো, সেগুলো ছিল দৃশ্যকাব্য। এ জন্য সংস্কৃতে নাটককে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য। কিন্তু নাটককে শুধু দেখার বিষয় বললে পুরোটা বলা হয় না, এতে শোনারও বিষয় থাকে। নাটক মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখা এবং সংলাপ শোনার মাধ্যমে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়। এটি একটি মিশ্র শিল্পমাধ্যম। সংস্কৃতে একে বলা হয়েছে কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।' নাটক পাঠ করা যেতে পারে; মঞ্চে, টিভি-রেডিও বা অন্য গণমাধ্যমে অভিনীত হতে পারে। বর্তমান সময়ে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যম।

খ. নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল

সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মূলত পাঠের জন্য হলেও নাটক প্রধানত অভিনয়ের জন্য। তাই এর বিশেষ কিছু গঠনবৈশিষ্ট্য রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য থাকলেও নাটকে সাধারণত চারটি উপাদান থাকে। সেগুলো হলো—১. কাহিনী ২. চরিত্র ৩. সংলাপ ও ৪. পরিবেশ। নাটকের পাত্রপাত্রী বা চরিত্রগুলোর সংলাপ অথবা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে একটি কাহিনী গড়ে ওঠে। কাহিনীটি হয়তো মানবজীবনের কোনো খণ্ডাংশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

প্রতিটি নাটকে এক বা একাধিক চরিত্র থাকে। নাটকের কাহিনী বা ঘটনা মূলত নাটকের এই পাত্রপাত্রী বা চরিত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। চরিত্রগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে নাটকের কাহিনী প্রকাশিত হয়। আবার চরিত্রগুলো মুখর হয় সংলাপের ভেতর দিয়ে। বলা যায়, সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপ কাহিনী ও চরিত্রগুলোকে ব্যক্ত করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। সংলাপের মাধ্যমেই তৈরি হয় নাট্য পরিস্থিতি। উপন্যাস বা গল্পে লেখক বর্ণনার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা করতে পারেন। নাটকে সে সুযোগ থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন সংলাপ। তাই নাটকের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে সংলাপের ওপর।

নাটকের কাহিনী, চরিত্র বা সংলাপ সংযোজনার জন্য নাট্যকারকে তৈরি করতে হয় উপযুক্ত পরিবেশের। অর্থাৎ কোন পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে এ ঘটনাটি ঘটছে বা কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে চরিত্র এ আচরণ করছে বা সংলাপ বলছে, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়। মঞ্চনাটকে মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, শব্দযোজনা ইত্যাদির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে এ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এ কাজটি মূলত করেন নাট্য নির্দেশক। নাট্যকার তাঁর নাটকেই এর নির্দেশনা রাখেন। তবে উত্তম নাটকের বৈশিষ্ট্য হলো সংলাপের বা অভিনয়ের ভেতর দিয়েই নাটকে পরিবেশ সৃষ্টি করা। নাটকের এই উপাদানগুলোকে একত্র করলেই সফল নাটক সৃষ্টি হয় না; নাটকে বিভিন্ন প্রকার ঐক্য রক্ষা করতে হয়। গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল নাটকে তিন প্রকার ঐক্যের কথা বলেছেন। ঐক্যগুলো হলো—

১. কালের ঐক্য (Unity of Time)
২. স্থানের ঐক্য (Unity of Place)
৩. ঘটনার ঐক্য (Unity of Event)

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি নাটকটি মঞ্চে যতক্ষণ ধরে অভিনীত হবে, ততটুকু সময়ের মধ্যে যা ঘটা সম্ভব নাটকে শুধু তাই ঘটানো হবে। এর বেশি কিছু ঘটানো হলে নাটকটির শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন হবে। নাটকটি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। এ বিষয়ে একদল নাট্য-সমালোচক মনে করেন, এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মঞ্চে যতটুকু কাহিনি ঘটানো সম্ভব, তাই নাটকে থাকা উচিত। স্থানের ঐক্য হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাটকে চরিত্রগুলো যে পরিমাণ স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ততটুকুই দেখানো। তার চেয়ে কমবেশি হলে নাট্যগুণ বিঘ্নিত হবে। নাটকে কাহিনির শুরু, বিকাশ ও পরিণতি থাকে। অর্থাৎ নাটকের কাহিনিটি আদি-মধ্য-অন্তসমন্বিত থাকে। ঘটনার ঐক্য হলো এর সূচনা বিকাশ ও পরিণতির মধ্যে সমতা বা সামঞ্জস্য রাখা। মূল ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন ঘটনার সমাবেশ ঘটালে নাটকটির কাহিনির সামঞ্জস্যতা বিঘ্নিত হয়। তাই নাটকে অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ ঘটানো যাবে না। যা কিছু ঘটানো হবে, তা একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে হবে। নাটকে একটি কাহিনি যেভাবে অগ্রসর হয়, তাকে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। পর্বগুলো হলো–

১. কাহিনির আরম্ভ বা মুখ (Exposition)
২. কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি বা প্রতিমুখ (Rising Action)
৩. কাহিনির উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব বা গর্ভ (Climax)
৪. গ্রন্থিমোচন বা বিমর্ষ (Failing Action)
৫. যবনিকাপাত বা উপসংহৃতি (Conclusion)

অর্থাৎ একটি নাটক শুরু হওয়ার পর তার কাহিনির বিকাশ ঘটবে, এরপর বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে কাহিনিটি চূড়ান্ত দ্বন্দ্বমুহূর্ত সৃষ্টি হবে। তারপর কোনো সত্য বা তথ্য প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নাটকটির চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে এবং সবশেষে একটি পরিসমাপ্তি ঘটবে।

মনে রাখা প্রয়োজন, এসব বৈশিষ্ট্য নাটকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। সব নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। যেমন, সাম্প্রতিক অনেক নিরীক্ষাধর্মী বা অ্যাবসার্ড নাটকে নাটকের বর্ণিত এ উপাদানগুলো না-ও থাকতে পারে। স্যামুয়েল বেকেট রচিত 'ওয়েটিং ফর গডো'কে এভাবে পাঁচ পর্বে বিভক্ত করা যায় না। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার বা সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থিয়েটারের ক্ষেত্রে নাটকের এ শর্ত অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এখানে মূলত প্রথাগত বা আদর্শ নাটকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ. বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে নাটক অভিনীত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায়ও দেখা গেছে, চর্যাপদ নৃত্য ও অভিনয়সহ বৌদ্ধ মন্দিরে পরিবেশিত হতো। এ থেকে বলা যায়, বাংলা নাটকের ইতিহাস হাজার বছরের। আমাদের যাত্রাপালার ঐতিহ্যও বেশ পুরনো। তবে নাটক অর্থে আমরা আধুনিক যে মঞ্চ নাটকের (Proscenium theatre) সাথে পরিচিত তা বাংলা অঞ্চলে এসেছে ইউরোপ থেকে। অবশ্য কলকাতায় প্রথম মঞ্চনাটকের যিনি আয়োজন করেন, তিনি ছিলেন একজন রাশিয়ান নাগরিক। তাঁর নাম হেরাসিম স্তেপানভিচ্ লেবেদেফ। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর তিনি ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে 'কাল্পনিক সংবদল' নামে মঞ্চায়িত করেন। নাটকটি তাঁকে অনুবাদে সাহায্য করেন গোলকনাথ দাস। একইভাবে তিনি 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর' মঞ্চায়ন করেন। লেবেদেফ এ অঞ্চল থেকে চলে গেলে মঞ্চনাটকে ছেদ পড়ে। তার বেশ কয়েক বছর পর ১৮৫২ সালে অভিনীত হয় তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' ও যোগেশচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২)। তার পরের দুবছরে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) ও রাম নারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) মঞ্চায়িত হয়।

প্রথম বাংলা আধুনিক নাটক রচনার কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩)। তিনি পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসরণ করে ১৮৫৯ সালে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন। তারপর একে একে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী'(১৮৬১), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন।

তাঁর সমসাময়িক আরেকজন নাট্যকার হলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)। তাঁর বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রয়েছে– 'নীল দর্পণ' (১৮৬০), 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ইত্যাদি।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার। তাঁর রচিত বিখ্যাত নাটক ও প্রহসনের মধ্যে রয়েছে– 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩), 'বসন্ত কুমারী' (১৮৭৩), 'এর উপায় কি?' (১৮৭৬) ইত্যাদি। এ সময়ের অন্যান্য নাট্যকারের নাটক ও প্রহসনের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯০৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) 'সাজাহান' (১৯০৯), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৪-১৯২৭) 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩) ইত্যাদি।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিচিত্র ধারার নাটক রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর লিখিত বিখ্যাত নাটকসমূহের মধ্যে রয়েছে 'ডাকঘর' (১৯১২), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) প্রভৃতি।

রবীন্দ্র-পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে– শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৩৮), বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪), তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' (১৯৫১), উৎপল দত্তের 'কল্লোল' (১৯৬৮), বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫) প্রভৃতি।

ঘ. বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল মূলত কলকাতা। ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ঢাকাকে কেন্দ্র করে নাট্যচর্চা গড়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের নাট্যচর্চায় স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলের সমাজবাস্তবতা চিত্রিত হতে থাকে, যাতে বাঙালি মুসলমানদের সমাজচিত্রই বেশি। এ ধারার নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৮৯) ও আসকার ইবনে শাইখ। নুরুল মোমেন রচিত নাটকের মধ্যে রয়েছে– 'নয়া খান্দান', 'নেমেসিস', 'এমন যদি হতো', 'রূপান্তর' প্রভৃতি। আসকার ইবনে শাইখের নাটকের মধ্যে রয়েছে– 'তিতুমীর', 'অগ্নিগিরি', 'রক্তপদ্ম', 'বিদ্রোহী পদ্মা', 'এপার ওপার' প্রভৃতি।

বাংলাদেশের আধুনিক ধারার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) ও সৈয়দ ওয়ালীউলাহ (১৯২২-১৯৭১) অগ্রণী নাট্যকার। মুনীর চৌধুরী রচিত নাটকসমূহের মধ্যে রয়েছে– 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২), 'কবর' (১৯৬৬), 'চিঠি' (১৯৬৬) ইত্যাদি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা রয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে– সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) রচিত 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৬৫), 'মহাকবি আলাওল' (১৯৬৬); শওকত ওসমান (১৯১৯-১৯৯৮) রচিত 'আমলার মামলা', 'কাকর মনি'; আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) রচিত 'ইহুদির মেয়ে', 'মায়াবী প্রহর'; আনিস চৌধুরী (১৯২৯ - ১৯৯০) রচিত 'মানচিত্র', 'এ্যালবাম'; সাঈদ আহমদ (১৯৩১ - ২০১০) রচিত 'কালবেলা', 'মাইলপোস্ট', 'তৃষ্ণায়', 'শেষ নবাব'; মমতাজ উদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯) রচিত 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা', 'হরিণ চিতা চিল', 'রাজা অনুস্বারের পালা', 'এই সেই কণ্ঠস্বর', 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'; আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৯৪৩-২০০৮) রচিত 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়', 'চারদিকে যুদ্ধ', 'সেনাপতি', 'অরক্ষিত মতিঝিল'; সেলিম আল দীন রচিত (১৯৪৮-২০০৮) রচিত 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন', 'সর্প বিষয়ক গল্প', 'কিত্তনখোলা', 'প্রাচ্য', 'নিমজ্জন'; সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) রচিত 'নূরুলদীনের সারা জীবন', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'গণনায়ক'; মামুনুর রশীদ (জন্ম. ১৯৪৮) রচিত 'ওরা কদম আলি', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'এখানে নোঙর' ইত্যাদি।

৬. বহিপীর নাটক ও নাট্যকার পরিচিতি: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট চট্টগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমাদউল্লাহ ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। মাতা নাসিম আরা খাতুন ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মাত্র আট বছর

বয়েসে মাতৃহারা হন। তিনি ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল ডিস্টিংক্শনসহ বিএ। তাঁর পেশাজীবন শুরু হয় 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার মধ্য দিয়ে। মাঝখানে কিছুদিন বেতারেও চাকরি করেন। তারপর বিদেশে তৎকালীন পাকিস্তান দূতাবাসে কাজ করেন। ইউনেস্কো সদর দপ্তর প্যারিসে সর্বশেষ কাজ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্যারিসে থেকেই বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেন।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'লালসালু' (১৯৪৯), নাটক 'বহিপীর' (১৯৬০), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), গল্পগ্রন্থ 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫), নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৫), উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)। সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি 'পিইএন পুরস্কার' (১৯৫৫), 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' (১৯৬১), 'আদমজী পুরস্কার' (১৯৬৫) ও 'একুশে পদক' (মরণোত্তর, ১৯৮৪) লাভ করেন। তিনি ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

বহিপীর

'বহিপীর' নাটকটি ১৯৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে ঢাকায় 'পিইএন ক্লাবে'র উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে সেখানে বাংলা নাটকের প্রতিযোগিতায় 'বহিপীর' নাটকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে।

'বহিপীর' নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে এক পিরকে কেন্দ্র করে। এই পির সারা বছর বিভিন্ন জেলায় তাঁর অনুসারীদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। এক এক এলাকায় এক এক ধরনের ভাষা। তাই তিনি বিভিন্ন এলাকার ভাষা শিক্ষা না করে বইয়ের ভাষায়ই কথা বলে থাকেন। এ জন্য তাঁর নাম হয়েছে 'বহিপীর'। নাটকের এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নাম অনুসারেই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'বহিপীর'। নামটির একটি প্রতীকী তাৎপর্যও রয়েছে। বাঙালি মুসলমান সমাজে পির সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় বইয়ের পাতা থেকে। মুলত ইসলাম ধর্মের সুফিবাদী ব্যাখ্যার সূত্র ধরেই পির সমাজের সৃষ্টি। এ হিসেবে তাঁরা ধর্মীয় ব্যাখ্যা মাসায়েল বইয়ের পাতা থেকেই মানুষের সংস্কারকে পুঁজি করে সমাজে ছড়িয়ে পড়েন। নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পিতা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। পিতার বদলির চাকরি সূত্রে ওয়ালীউল্লাহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পান। তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজে তখন জেঁকে বসা পির প্রথা কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান। ফলে তিনি 'লালসালু' উপন্যাসে যেমন, তেমনি এই নাটকেও সে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

নাটকটি গড়ে উঠেছে বহিপিরের সর্বগ্রাসী স্বার্থ ও নতুন দিনের প্রতীক এক বালিকার বিদ্রোহের কাহিনিকে কেন্দ্র করে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপির। তিনি দুই বছরান্তে একবার শিষ্য বা মুরিদদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। তখন মুরিদরা সর্বস্ব দিয়ে তাঁর সেবা করেন। এবার এক মুরিদ তাঁর মাতৃহারা কন্যা তাহেরাকে এই বৃদ্ধ পিরের সাথে জোর করে বিয়ে দেন। তাহেরা তা মেনে না নিয়ে পালিয়ে যায়। সে পালিয়ে হাতেম আলি জমিদারের শহরগামী বজরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বহিপির তাঁর সঙ্গী হকিকুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে তার সন্ধানে বের হন। পথিমধ্যে বহিপিরের নৌকা দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং তিনি ঘটনাচক্রে হাতেম আলির বজরাতেই আশ্রয় লাভ করেন। একসময় তিনি জানতে পারেন, এই বজরাতেই তাঁর নববিবাহিত স্ত্রী তাহেরাও আছে। তখন তিনি তাকে পাওয়ার জন্য নানারকম কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। অন্যদিকে বজরায় জমিদারপুত্র হাশেম আলি তাহেরার করুণ কাহিনি জেনে তার পক্ষ নেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বজরার মধ্যে দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। বহিপির জঘন্য কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। এমনকি জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগও গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহিপির জয়ী হতে পারেন না। তাহেরা ও হাশেম আলি সব বাধার জাল ছিন্ন করে পালিয়ে যায়। বহিপির অবশেষে বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

চ. নাটকের চরিত্র পরিচিতি: বহিপীর

বহিপীর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নাম চরিত্র। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। তিনি অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের কুসংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে তাঁর ধর্মব্যবসায় পরিচালনা করেন। তিনি সারা বছর তাঁর মুরিদদের বাড়ি

বাড়ি ঘুরে বেড়ান। তাদের কাছ থেকে অর্থসম্পদ সংগ্রহ করেন। এবার তিনি বৃদ্ধ বয়েসে এক মুরিদের কন্যাকে বিয়ে করে বসেন। মুরিদ ও কন্যার সৎমাতা মিলেই সব আয়োজন করে। কিন্তু কন্যা পালিয়ে যায়। তখন তিনি নিজেই স্ত্রীর সন্ধানে বের হন এবং ঘটনাচক্রে তার সন্ধানও পেয়ে যান। তখন তিনি অত্যন্ত চালাকি ও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাটকে আমরা তাঁকে এ পর্যায়েই দেখতে পাই। আমরা দেখি, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমান লোক। বাস্তব বুদ্ধিও তাঁর টনটনে। তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধারে তিনি পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করার অভিনয় করেন। কিন্তু জানে, এতে অনেক ঝামেলা। তাই ওই পথে এগোন না। তিনি প্রথমে ধর্মীয় বিয়ের দোহাই দেন। কিন্তু তাহেরা তার পাল্টা যুক্তি দিলে তা থেকে তিনি সরে আসেন। তিনি তখন মানবিকতার বাহানা করেন। বলেন এ মেয়ে কখনো স্নেহ-মমতা পায়নি। তাঁর কাছ থেকে স্নেহ-মমতা পেলে বুঝতে পারবেন। এতেও কাজ না হওয়ায় তিনি জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি টাকা দিয়ে জমিদারের জমিদারি রক্ষা করার প্রস্তাব করেন। শর্ত হিসেবে তাহেরাকে ফেরত চান। কিন্তু তাঁর সব চক্রান্ত একসময় ব্যর্থ হয়। তাহেরা ও হাশেম আলি পালিয়ে যায়। তখন আমরা দেখি তিনি বাস্তবতা মেনে নেন। তিনি তাদের তাড়া করতে নিষেধ করেন। এতে তাঁর একই সাথে বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তবজ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহেরা

তাহেরা এই নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এবং একবিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কেননা, তাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। সে মাতৃহারা। তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমাতা তাকে বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সে এ অন্যায় বিয়ে মেনে না নিয়ে পালিয়েছে। দুঃসাহসের সাথে শহরগামী বজরায় চড়ে বসেছে। কিন্তু একসময় পিরের কাছে ধরা পড়ে। বজরার একমাত্র হাশেম আলি ছাড়া অন্য সবাই প্রায় তার বিরুদ্ধে গেলেও সে বৃদ্ধের সাথে তার না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। এ হিসেবে তাহেরা একটি অত্যন্ত অনমনীয় চরিত্র। কিন্তু যখন সে জমিদারের অসহায়ত্বের কথা জেনেছে, তখনই সে রাজি হয়েছে। মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। অর্থাৎ সে একই সাথে অনমনীয় ও মানবিক চরিত্র। সবশেষে সে নতুন জীবনের সন্ধানে হাশেম আলির হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক চরিত্র বলা যায়।

হাশেম আলি

হাশেম আলি জমিদারপুত্র। সে এই নাটকে কাহিনির দৃশ্যপট পরিবর্তনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপিরের বিপরীত চরিত্র। সে অত্যন্ত শান্তভাবে বহিপিরের কূটচালকে মোকাবিলা করেছে এবং পরিশেষে জয়লাভ করেছে। বহিপির নেতিবাচক চরিত্র। ব্যক্তিগত স্বার্থের হিসেবে সে জীবন ও জগৎকে গণনা করে। অন্যদিকে হাশেম আলি ইতিবাচক চরিত্র। মানবীয় মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের গুরুত্ব তার কাছে সর্বাধিক। এ অর্থে হাশেম আলিকেই নায়ক এবং বহিপিরকে খলনায়ক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। হাশেম আলি জমিদারপুত্র হলেও বৈষয়িক বিবেচনা তার কাছে কম। জমিদারি নিয়ে ভাবে না। সে বিএ পাস। এখন একটি প্রেস বসাতে চায়। পিতার জমিদারি চলে গেলে এবং এজন্য প্রেস বসাতে না পারলেও সে চিন্তিত নয়। সে ভাবে, যখন পড়ালেখা করেছে তখন একটা কিছু হয়ে যাবে। সে অত্যন্ত যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। বজরায় সেই প্রথম অচেনা মেয়েটির সমস্যার প্রকৃতি উপলব্ধি করে। সে তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। মেয়েটি আত্মহনন করতে গেলে সে তাকে রক্ষা করে। পুরো বজরার মানুষ যখন তার বিরুদ্ধে তখনো সে মেয়েটির পক্ষ ত্যাগ করেনি। নাটকে তাকে অস্থিরচিত্ত বলে বর্ণনা করা হলেও সে তার অবস্থানে ছিল স্থির। এ ক্ষেত্রে মাতার সাবধানবাণী, বহিপিরের ভীতি প্রদর্শন, পিতার করুণ মুখ কিছুই তাকে পিছু হটাতে পারেনি। সে তাহেরাকে বাঁচাতে চেয়েছে। এমনকি বিয়ে করে হলেও। জমিদারপুত্র হিসেবে তাহেরা তার কাছে অচেনা একটি পরিচয়হীন মেয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সব বৈষয়িক বিষয়বস্তু ত্যাগ করে মেয়েটিকে নিয়ে অনিশ্চিত-অজানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। তার এ পদক্ষেপকে অবশেষে বহিপির নিজেই সঠিক বলে অনুমোদন করেছেন। হাশেম আলি ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র।

হাতেম আলি

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ার কারণে তাঁর জমিদারি 'সূর্যাস্ত আইনে' নিলামে ওঠে। জমিদারি রক্ষার জন্য তিনি শহরের বন্ধুদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। তাঁর জমিদারি নিলামের সংবাদটি তিনি পরিবারের সবার কাছে গোপন রেখেছেন। চিকিৎসার অজুহাত দিয়ে তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য শহরে গিয়েছেন, কিন্তু তিনি অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি বহিপিরের কাছে কথাটি বলেন। বহিপির তাঁকে কঠিন শর্ত দেয়। অর্থ ধারের বিনিময়ে তাঁর স্ত্রীকে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। মেয়েটিও এতে রাজি হয়। কিন্তু বেঁকে বসেন জমিদার নিজেই। কেননা তাঁর নিজেকে নিজের কাছে কসাই মনে হতে থাকে। তাঁর মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। তিনি টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে হাতেম আলির উচ্চ নৈতিকতাবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। হাতেম আলি স্থিতধী, আত্মনিমগ্ন উচ্চ মানবিক চেতনাসম্পন্ন একটি উজ্জ্বল চরিত্র।

অপ্রধান চরিত্রসমূহ

হকিকুল্লাহ ও জমিদার গিন্নি এই নাটকের দুটি অপ্রধান চরিত্র। জমিদার গিন্নি অত্যন্ত সাদামাটা একটি চরিত্র। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিন্তু অত্যন্ত ধর্মভীরু। বজরায় একটি অচেনা মেয়ে আশ্রয় চাইলে তিনি তাকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। মেয়েটির দুঃখের কাহিনি জেনে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। আবার যখন জেনেছেন, মেয়েটি একজন পিরের পালিয়ে আসা স্ত্রী তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, এ বিয়ে অন্যায়, কিন্তু পিরের অভিশাপের ভয়ে ভীত থেকেছেন। আবার ছেলে ও পির মুখোমুখি অবস্থান নিলে তিনি পিরের পক্ষ নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু ছেলেকেও শক্তভাবে দমন করতে পারেননি। তাঁর মধ্যে বাঙালি চিরায়ত মায়ের প্রতিমূর্তি ফুটে উঠেছে। হকিকুল্লাহ পিরের ধামাধরা একটি ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। সে বহিপিরের সহকারী। নাটকে সে মূলত পিরের আজ্ঞা পালন করেই চলেছে।

নাটকটিতে প্রতিফলিত সমাজচিত্র থেকে বোঝা যায়, নাটকটির সময়কাল উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনালগ্ন। নাটকে দেখা যায়, জমিদার হাতেম আলি 'সূর্যাস্ত আইনে' তাঁর জমিদারি হারাতে বসেছেন। 'সূর্যাস্ত আইন' প্রণীত হয় ১৭৯৩ সালে এবং এ আইনে জমিদারি হারাতে থাকে এ সময় পর্যন্ত। সে সময়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জেঁকে বসা পির প্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের চিত্র ফুটে উঠেছে এই নাটকে। এই নাটকে আমরা দেখতে পাই পির সাহেবকে ধনিগরিব সবাই অসম্ভব ভয় ও মান্য করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের পিরকে পেলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার সেবা করার জন্য পাগল হয়ে যায়। ধনসম্পদ থেকে শুরু করে নিজ কন্যাকে পর্যন্ত তারা দান করে। নাটকটি বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত পির প্রথার একটি বিশ্বস্ত দলিল। কিন্তু নাটকটি শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোর পথ দেখায়। এ অবস্থা বদলানোর সংকেত প্রদান করে। নাটকটির দুটি প্রধান চরিত্র হাশেম আলি ও তাহেরা এ ব্যবস্থা ভেঙে বেরিয়ে আসে। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের স্থানে মানবিকতার জয় হয়। অপরাপর চরিত্রগুলোর মধ্যেও যৌক্তিক মানবিক বোধ জাগ্রত আছে বোঝা যায়। নাটকটি এভাবে মানবিক জাগরণের দৃশ্যকাব্য হয়ে ওঠেছে।

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

[হেমন্তের বেলা নয়টা। পানির শব্দ, দূরে জাহাজের সিটি-ধ্বনি, তীরে ফেরিওয়ালার হাঁকাহাঁকি, ভাটিয়ালি গানের অতি ক্ষীণ রেশ ইত্যাদির সমবেত কোলাহলের মধ্যে পর্দা উঠলে দেখা যাবে মঞ্চের অধিকাংশ স্থানজুড়ে দু-কামরাওয়ালা একটি রঙদার বজরা। কোণে সামান্য উঁচু পাড়, বজরা থেকে সে পাড়ে যাতায়াতের জন্য একটা সিঁড়ি।

দর্শকের দিকে বজরাটি খোলা। পেছনে জানালাগুলোর অধিকাংশ তোলা, যার ভেতর দিয়ে অপর পারের আভাসও কিছুটা দেখা যাবে। বজরার সামনে পাটাতনে বসে একটি চাকর মসলা পেষে; একটু দূরে একজন মাঝি আপন মনে দড়ি পাকায়। তারই কাছাকাছি বসে হকিকুল্লাহ হুঁকা টানে। ছাদে শুকায় একটি রঙিন আলখাল্লা ও পায়জামা।

বড় কামরায় হাতেম আলি চাদরে আধা-শরীর ঢেকে বহিপীরের সঙ্গে কথোপকথন করেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের মতো, মুখে চিন্তার ছাপ। কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। বহিপীরের বয়স কিছু বেশি কিন্তু মজবুত শরীর। মুখে আধা-পাকা দাড়ি, মাথায় চুল ছোট করে ছাঁটা।

পাশের ঘরে হাতেম আলির ছেলে হাশেম আলি মোড়ায় বসে বসে তার মা খোদেজা ও তাহেরার তরকারি কোটা দেখে। হাশেম আলি যুবক মানুষ; অস্থির মতি ও একটুতে রেগে ওঠার অভ্যাস। কখনো সে পায়চারি করে, কখনো বসে, কখনো বা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে জানালার ধারে বিছানা পাতা বেঞ্চির ওপর।

তাহেরার বয়স অল্প; মুখে সামান্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। সেটা অবশ্য সব সময়ে পরিলক্ষিত হয় না।

সারা সকাল খোদেজা আর তাহেরা রান্নাবান্নার কাজ করবে। বাইরে যে চাকরটিকে মসলা পিষতে দেখা যাবে, সে থেকে থেকে আসবে যাবে এটা-সেটা নিয়ে।

পর্দা ওঠার পর হাতেম ও বহিপীরের আলাপ করতে দেখা যাবে বটে, কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাশের ঘরে হাশেম আলি ও খোদেজার কথাবার্তা শেষ না হয়। দুই কামরার মধ্যে দরজাটি বন্ধ]

হাশেম — কী ঝড়ই হলো শেষ রাতে! এমন ঝড় কখনো দেখিনি। সময়মতো খালের ভেতর ঢুকতে না পারলে কে জানে কী হতো। (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) আপনি ভয় পেয়েছিলেন কী?

তাহেরা — (মাথা নাড়ে কেবল)

খোদেজা — যে মেয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে পারে, সে অত সহজে ভয় পায় না। কিন্তু আমি এ কথা বুঝি না যে তুমি কী করে পালাতে পারলে। কথাটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কে কখন এমন কথা শুনেছে? (একটু থেমে) পালাবার সময় সত্যিই এ কথা খেয়াল হয়নি যে কোথায় যাব কোথায় থাকব কী করে এমন কাজ করি?

তাহেরা — (আবার মাথা নাড়ে)

খোদেজা — (কাজ করতে করতে) কাল ডেমরার ঘাটে আমরা যদি বজরা না থামাতাম আর বিপদে পড়েছ দেখে তোমাকে যদি তুলে না নিতাম, তবে কোথায় থাকতে এখন, যেতেই বা কোথায়? (উত্তর না পেয়ে) হঠাৎ দেখি তীরে ভিড়। একটা ছেলে কাঁদছে, পাশে অল্প বয়স্কা একটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। চাকরটা এসে বলল, একটি মুসলমান মেয়ে বিপদে পড়েছে।

সঙ্গে একটি ছেলে, সেও ডাকচিৎকার পেড়ে কাঁদছে। তাদের নাকি কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই? জানেও না কোথায় যাচ্ছে। শুনে ভিড় জমে গেছে, বদলোকেরা তোমাকে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে, এক-আধটু ঠাট্টা-মস্করা করতেও শুরু করেছে। (থেমে) কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ; আমি তোমাকে ডেকে না পাঠালে কী হতো তোমার?

তাহেরা — (সামান্য হেসে) অত ভাবলে কি কেউ পালাতে পারে?

হাশেম — ছেলেটি কে ছিল?

তাহেরা — চাচাতো ভাই।

খোদেজা — তার কথা সে বলেছে আমাকে। অল্প বয়সের ছেলে, না বুঝে না শুনে ওর কথায় পালানোর সাথী হয়েছিল। কিন্তু ডেমরায় পৌঁছে ছেলেটার হঠাৎ হুঁশ হলো: এ কী সে করছে। তখন বলে, পুলিশ এলো, এসে ধরল তাদের। তা ছাড়া ক্ষিধাও পেয়েছে অথচ পয়সা নাই কারও কাছে। ভয়ে আর ক্ষিধায় কাঁদতে লাগল ছেলেটা। (তাহেরাকে) অথচ তুমি মেয়ে হয়েও তোমার চোখে না ছিল ভয়, না ছিল কান্না, শাবাশ মেয়ে তুমি। এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায়, জানতাম না।

তাহেরা — (হেসে) আপনার তো বুড়োর কাছে বিয়ে হয়নি, আপনি কী করে বুঝলেন কেন বা কী করে পালিয়েছি?

খোদেজা — (বিস্ময়ে) কথা শোনো! বুড়োর কাছে বিয়ে হলেই এমন করে পালায় নাকি কেউ? বিয়ে হলো তকদিরের কথা। কারও ভালো দুলা জোটে, কারও জোটে না, কেউ স্বাস্থ্য, সম্পদ সবাই পায়, কেউ পায় না। তাই বলে পালাতে হয় নাকি? ওটা কত বড় গুনাহ্ তা বোঝো না?

তাহেরা — (মুচকি হেসে, উত্তর না দিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে) নদীতে খালি কচুরিপানা। নদীতে বেগুনি রঙের শাপলা থাকে না, পদ্ম-পলাশ থাকে না। খালি কচুরিপানা, কেবল কচুরিপানা ভেসে যায়।

খোদেজা — না, মেয়েটির চিন্তাভাবনা নাই। সুখেই আছে।

হাশেম — বাড়িতে কে আছে আপনার?

তাহেরা — (একনজর হাশেমের দিকে তাকিয়ে) বাপজান আর সৎমা। যে বুড়ো পীরের সঙ্গে বাপজান আমাকে বিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মুরিদ। অবশ্য আমি না, আমার বাপজান ও সৎমাই তাঁর মুরিদ। বছরে-দুইবছরে পীরসাহেব একবার এলেই তাঁরা তাঁর খাতির-খেদমত করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। (থেমে হঠাৎ রেগে) আমি কি বকরি-ঈদের গরু ছাগল নাকি?

খোদেজা — কী ঢঙের কথাই যে তুমি বলো! পীরের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা কোনো খারাপ কথা নয়। (হঠাৎ মনে পড়ায়) ভালো কথা, পীরসাহেব রাতেও খাবেন নাকি, হাশেম?

হাশেম — না। দুপুরে খাওয়ার পরেই চলে যাবেন। আব্বা অনেক বললেন কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তাঁর নাকি জরুরি কাজ আছে। পীরসাহেবের লেবাসও দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। কাল রাতে মাঝিরা তাঁকে আমাদের বজরায় তুলে না নিলে তিনি হয়তো ডুবেই মারা যেতেন।

খোদেজা — তাঁর নৌকার সঙ্গে বজরার কী করে ধাক্কা লাগল বুঝলাম না।

হাশেম — ঝড়ের সময় বজরা আর নৌকা একই সঙ্গে খালের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। অন্ধকারের মধ্যে আর হাওয়ার ধাক্কায় মাঝিরা বোধ হয় ঠিক সামাল দিতে পারেনি। ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা এক মিনিটে আধা-ডোবা হয়ে গেল। ভাগ্য ভালো, বজরার কিছু হয়নি। মনে হয়, ধাক্কা খাওয়ার আগেই পীরসাহেবের নৌকাটা বেসামাল হয়ে পড়েছিল। পীরসাহেব আর তাঁর সঙ্গী দুজনেই কিছুটা নাকানি-চুবানি খেয়েছেন।

খোদেজা — কিন্তু আমাদের বজরায় কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কোত্থেকে এলো অচেনা-অজানা এই মেয়েটি। তারপর পানিতে ডুবে মরতে মরতে বজরায় উঠে জান বাঁচালেন এক পীরসাহেব।

হাশেম — (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) এই পীরসাহেব আপনার পীরসাহেব নন তো?

তাহেরা — না। তাঁকে ভালো না দেখলেও তাঁর গলা অনেক শুনেছি। নিশ্চয়ই গলা চিনতাম। তা ছাড়া তিনি হঠাৎ নৌকা করে এদিকে যাবেনই বা কোথায়?

হাশেম — (রসিকতা করে) হয়তো আপনার খোঁজে বেরিয়েছেন।

তাহেরা — (কথাটা ভেবে ভয় পায়; কিছু বলে না।)

খোদেজা — তাহলে তো ভালোই হয়। এই বজরাতেই পীরসাহেব আর তাঁর বিবির মিলন হয়, মাঝখানে থেকে আমরা কিছু সওয়াব পাই।

তাহেরা — (হঠাৎ তরকারি কোটা বন্ধ করে অধীরভাবে সোজা হয়ে বসে) না না, অমন কথা বলবেন না।

খোদেজা — (বিরক্ত হয়ে) না, এমন মেয়ে কখনো দেখিনি, বাবা। বয়স হলেও পীর হলো পীর। তা ছাড়া জোয়ান পীর তো দেখা যায় না।

[পাশের ঘর থেকে হাতেম আলি ছেলেকে ডাকেন, হাশেম, হাশেম। হাশেম সেই কামরায় যায়। যাওয়ার সময় দরজা খুলে তাহেরা উঁকি মেরে দেখে, তারপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তাহেরা আর খোদেজা মাঝে মাঝে আলাপ করবে বটে, কিন্তু এবার তাদের কথার আওয়াজ দর্শকদের নিকট পৌঁছাবে না।]

হাতেম আলি — পাশের ঘরে বসে আছ কেন? পীরসাহেবের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করো। (হাশেম দূরে একটা মোড়ায় বসে।) ছেলেটি কলেজে পড়া শেষ করে এখন ছাপাখানা দিতে চায়। বলে, ছাপাখানার ব্যবসা বড় ভালো। আমি কিন্তু অত বুঝি না। শরীরটা আমার ভালো নাই। আমি বলি, কদিন বাঁচি না-বাঁচি ঠিক নাই, যত দিন জিন্দা আছি আমার সঙ্গে থাকো। আমার তো আর ছেলেপুলে নাই। কিন্তু কী বলব, সবই খোদার মর্জি, তাঁর ইচ্ছা বোঝা মুশকিল, কার ভাগ্যে কী আছে তাই বা কে জানে। ধরুন না কেন, আপনার সঙ্গে এইভাবে দেখা হবে এ–কথা কী কখনো কল্পনা করতে পেরেছি? কে ভেবেছিল হঠাৎ এমন ঝড় উঠবে, খালের ভেতরে ঢোকার সময় আমার বজরার সঙ্গে আপনার নৌকার এমন ধাক্কা লাগবে, যার দরুন আপনার নৌকা আধা-ডোবা হবে? কিন্তু সে যা-ই হোক, আপনার যে শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় নাই, তার জন্য খোদার কাছে হাজার শোকর। তা ছাড়া, দুর্ঘটনার সময় আপনাকে আমার বজরায় স্থান দিতে পেরেছি তাতে আমি নিজেকে বড় ধন্য মনে করছি।

বহিপীর — সবই খোদার হুকুম। (থেমে) আপনার সম্পূর্ণ পরিচয়-তো এখনো পাইলাম না।

হাতেম আলি — আমার নাম হাতেম আলি। রেশমপুরে আমার যৎকিঞ্চিৎ জমিদারি আছে। এইটে আমার একমাত্র ছেলে, নাম হাশেম আলি। একটু অস্থির প্রকৃতির, খোদা চাহে-তো মতিগতি ভালোই। সে যা-হোক। কদিন ধরে আমার শরীরটা মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না, ভাবলাম, শহরে এসে দাওয়াই করাই। একাই আসতে চেয়েছিলাম; কিন্তু বিবি সাহেবা আর ছেলেটি একা আসতে দিল না! যাক্, এসেছে ভালোই হয়েছে। (থেমে) আচ্ছা পীরসাহেব, বেয়াদপি মনে না করেন তো একটি সওয়াল করি। আপনার নাম বহিপীর কী করে হলো?

বহিপীর — আপনি লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি। ইহার একটি হেতু আছে। দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একেক ঢঙের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কী করি। আমাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়, আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতে আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি, বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান। তা ছাড়া কথ্য ভাষা আমার কানে কটু ঠেকে। মনে হয়, তাহাতে পবিত্রতা নাই, গাম্ভীর্য নাই। আমার কর্তব্য মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। উক্ত কার্যের জন্য পুস্তকের ভাষার মতো পবিত্র ও গম্ভীর আর কোনো ভাষা নাই। কথ্য ভাষা হইল মাঠ ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।

হাতেম আলি — আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, বইয়ের ভাষার মতো আর ভাষা নাই। একটা কথা পীরসাহেব, দুর্ঘটনায় আপনার যাত্রার ব্যাঘাত ঘটেনি তো? আপনি কি এই শহরেই আসছিলেন?

বহিপীর — (ইতস্তত করে) ব্যাঘাত? হ্যাঁ ব্যাঘাত কিছু ঘটিয়াছে বৈকি। তবে অতি নিকটেই কোথাও আমাকে যাইতে হইবে। একটু দেরি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। খাওয়া-দাওয়ার পরই হকিকুল্লাহ্ মজবুত দেখিয়া একটি নৌকা ঠিকা করিয়া লইবে, তারপর আবার রওয়ানা হইয়া পড়িব। জানে বাঁচিয়া আছি ইহাই যথেষ্ট। খোদার ভেদ বোঝা সত্যই মুশকিল। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটাইলেন, মরিতে মরিতে কেন আবার বাঁচিয়া রহিলাম আর আপনার বজরাতেই কেন বা আশ্রয় পাইলাম, তাহা তিনিই জানেন। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, নিশ্চয় ইহাতে কোনো গূঢ়তত্ত্ব আছে, যাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি বড় শ্রান্ত বোধ করিতেছি। আশা করি শরীর খারাপ হইবে না। কত আর ছোটাছুটি করিতে পারি। বয়স-তো হইয়াছে। একেকবার ভাবি, যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, কেবল মুরিদান করিয়াই জীবন কাটাইয়াছি। মুরিদ হওয়ার জন্য লোকেরা দলেবলে আসিয়াছে, কেহ কাঁদিয়াছে, কেহ ধনসম্পদ উজাড় করিয়া আমার পায় ঢালিয়া দিয়াছে। তাহারাই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমাকে কোনো অবসর দেয় নাই, এবাদত করিবার ফুরসত দেয় নাই। সারা জীবন কেবল মুরিদের মঙ্গল কামনাই করিয়াছি, কখনো ফল পাইয়াছি কখনো পাই নাই, সবই খোদার ইচ্ছা। কিন্তু এখনো সময় আছে। মধ্যে মধ্যে ভাবি, সমস্ত ছাড়িয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়ি যেই দিকে দুই চোখ যায়, সেই দিকে পা দুইটা আমাকে লইয়া যায়।

হাতেম আলি — হয়তো খোদা তা চান না।

বহিপীর — হয়তো।

খোদেজা — (পাশের ঘর থেকে) হাশেম! (এক ডাকেই হাশেম উঠে সেই কামরায় যায়।)

[এখন সে, কামরারই কথাবার্তার আওয়াজ দর্শকের কাছে পৌঁছাবে; বহিপীর ও হাতেম আলি হাত-মুখ নেড়ে কথা বলতে থাকবে বটে, কিন্তু সে আওয়াজ শোনা যাবে না।]

খোদেজা — মেয়েটি দ্যাখ কেমন করছে। তুই যখন পাশের কামরায় যাচ্ছিলি, তখন খোলা দরজা দিয়ে পীরসাহেবকে সে দেখেছে। ওর সন্দেহ হচ্ছে, তিনিই সেই পীর।

তাহেরা — (তরকারি কোটা ছেড়ে সোজা হয়ে বসে) তিনি কে?

হাশেম — তাঁর নাম বহিপীর, তিনি এদিককার লোক নন; উত্তরে সুনামগঞ্জে তাঁর বাড়ি।

তাহেরা — (সভয়ে আপন মনে) ইনিই তিনি, বহিপীর। যিনি বইয়ের ভাষায় কথা বলেন। বাপজান আর সৎমা যাঁর মুরিদ আর যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। (থেমে) তিনি আমার খোঁজে বেরিয়েছেন।

[হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে পানি দেখে।]

হাশেম — আম্মা! উনি কি করছেন ওখানে?

তাহেরা — (এদের দিকে ঘুরে বিস্ফারিত চোখে) খবরদার! আমার কাছে কেউ আসবেন না, এলেই আমি পানিতে ঝাঁপ দেব। আমি সাঁতার জানি না, পানিতে ডুবে মরব।

খোদেজা — (চিৎকার করে) অরে, এই মেয়েটা পাগলি দেখছি! কী বলে সে।

হাশেম — আম্মা চিৎকার করবেন না, পাশের ঘরে পীরসাহেব শুনবেন। তিনি এখনো জানেন না যে তাঁর বিবি এখানেই আছেন।

তাহেরা — (ব্যঙ্গ করে) তাঁর বিবি। বহিপীরের বিবি। তিনি আমাকে কখনো দেখেননি, তার ঘরও করিনি খেদমতও করিনি।

হাশেম — দেখুন, আপনি ওখান থেকে সরে আসুন। আপনার কোনো ভয় নেই। আপনার কথা পীরসাহেব জানেন না, জানবেনও না আর খেয়েদেয়ে দুপুরেই তিনি চলে যাবেন।

তাহেরা — (হঠাৎ নেবে বসে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। মনে হবে অনেকক্ষণ কাঁদবে কিন্তু শীঘ্রই চোখ মুছে শান্ত গলায়) আমাকে যখন আশ্রয় দিয়েছেন, তখন আর এইটুকুও আমার জন্য করুন, তাঁকে আমার কথা বলবেন না।

হাশেম — না না। কেউ বলবে না।

খোদেজা — হাশেম, সে কেমন কথা। পীরসাহেবকে না বলে কী করে পারি? তার সঙ্গে না গেলে কোথায় যাবে মেয়েটা, কে দেখবে তাকে?

হাশেম — আম্মা। এখন তো একটু চুপ করুন।

তাহেরা — আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। ডেমরা ঘাট থেকে তুলে নিয়ে বজরায় আশ্রয় দিয়েছেন। দয়া করে আরেকটু করুন। কারণ, আমি পীরসাহেবের সঙ্গে কিছুতেই যাব না। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মরব, তবু যাব না। আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না।

হাশেম — (হঠাৎ জোর দিয়ে) দেখুন, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কোনো ভয় নেই। আমি কথা দিচ্ছি, পীরসাহেবের সঙ্গে আপনাকে ফিরে যেতে হবে না।

খোদেজা — তুই আবার এর মধ্যে অত লম্বা-চওড়া কথা বলিস কেন? তোর বাপ ফিরে আসুন, তিনি বুঝে-শুনে যা-ই করতে বলবেন তা-ই করা হবে। (পাশের ঘর থেকে পীরসাহেব ডাকেন, হাশেম মিঞা) ঐ যে পীরসাহেব তোকে ডাকছেন। গিয়ে দ্যাখ, তাঁর কী চাই। তা ছাড়া এ ঘরে তোর অত ঘুরঘুর করার কী প্রয়োজন? মেয়েটারও যেন একটু লজ্জা-শরম নাই। থাকলে কী এমন করে পালাতে পারে?

বহিপীর — হাশেম বাবা–। ও হাশেম মিঞা!

হাশেম — (গলা উঁচিয়ে) এই যে আসছি পীরসাহেব। (তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে) আম্মা, ছেলে হয়েও আপনার সঙ্গে কোনো দিন এত কথা বলি নাই বা মুখের ওপর জবাব দিই নাই। কিন্তু এখন সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। কাজেই আমাকে বলতেই হচ্ছে। আম্মা, শোনেন আমার কথা। পথ থেকে একটা বিপন্ন মেয়েকে তুলে নিয়েছেন। ভুল করে হোক আর যা-ই করে হোক, তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন–সেটা একটি মেয়ের পক্ষে সোজা কথা নয়। আপনি বুঝতেই পারেন তাঁর মনের অবস্থা আপনার আমার মতো নয়। হলে কি তিনি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজের হাতে নিজের জান দেওয়ার কথা বলতেন? তা ছাড়া, ডেমরার ঘাটে তাঁকে বিপন্ন অবস্থায় দেখে আপনার মনে যখন মমতা জেগেছিল, তাঁকে না চিনে, না জেনেও যখন নিজের বজরায় তুলে নিয়েছেন, তখন তাঁর প্রতি আপনার কি একটু দায়িত্বও নেই? আম্মা, তাঁকে এখন আর কোনো কথা বলবেন না; একটু সবুর করে থাকুন। উনি যদি সত্যি হঠাৎ পানিতে ঝাঁপ দেন, তখন আপনি কি একা তাঁকে ঠেকাতে পারবেন?

খোদেজা — (বিস্ময়ে) তুই কী চাস? পীরসাহেবের বিবিকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

হাশেম — আমি বরঞ্চ পাশের ঘরে যাই, পীরসাহেব বারবার ডাকছেন।

[দ্রুতপায়ে পাশের ঘরে চলে যায়। খোদেজা কয়েক মুহূর্ত নত মুখে বসে থাকা তাহেরার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার রান্নায় হাত দেন।]

বহিপীর — এমন জোয়ান-মর্দ ছেলে, মায়ের আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকিবার অভ্যাস কেন?

হাশেম — রান্নাবান্না হচ্ছে, একটু সাহায্য করছিলাম। কেন ডাকছিলেন?

বহিপীর — বিশেষ কিছু না। ভাবিতেছিলাম, আপনার হইল কী। হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন না তো?

হাশেম — কী করে নিরুদ্দেশ হই? পানিতে ঝাঁপ দিয়ে না পড়লে ওই কামরা থেকে তো আর পালানো যায় না।

বহিপীর — উত্তম কথা, উত্তম কথা!

হাশেম — উত্তম কথা, কেন বলছেন পীরসাহেব?

বহিপীর — না না উহা একটি কথার কথা, কিন্তু যে জন্য ডাকিয়াছিলাম। আরে, তাই তো কী জন্য ডাকিলাম তাহা আর মনে পড়িতেছে না। বোধ হয়, একাকী বসিয়া বসিয়া ভালো লাগিতেছিল না। সর্বদা ওয়াজ-নছিহত করিবার অভ্যাস, কাহারও সঙ্গে কথা না কহিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারি না। তা ছাড়া একাকী চুপচাপ বসিয়া থাকিলে মনে অশান্তি হয়। সে কথা যাক। আপনার আব্বা ফিরিতে এত দেরি করিতেছেন কেন?

হাশেম — (পাড়ের দিকে তাকিয়ে) এই যে তিনি ফিরেছেন।

[হাতেম আলি অতি ধীর পায়ে প্রবেশ করেন, তাঁর মুখ চিন্তাভাবাচ্ছন্ন। তাঁকে আরও দুর্বল দেখায়, লাঠি হাতেই তিনি তফাতে বেঞ্চির ওপর বসে নীরব হয়ে থাকেন।]

হাশেম — আব্বা! আপনার কী হয়েছে? আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

বহিপীর — (হাতেম আলি কোনো উত্তর না দেয়ায়) খোদা না করুন, কোনো দুঃসংবাদ নাইতো জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি — (মুখ তুলে চেয়ে) দুঃসংবাদ? না, দুঃসংবাদ আর কী? তবে অসুস্থ শরীরে চলাফেরা করায়ও একটু হয়রান বোধ করছি। হাশেম, আমাকে এক গ্লাস পানি এনে দাও।

[হাশেম ক্ষিপ্রগতিতে পাশের ঘরে যায়, গিয়ে নিজেই কলসি থেকে পানি ঢালে।]

খোদেজা — পানি কার জন্য, হাশেম?

হাশেম — আব্বার জন্য, তাকে অত্যন্ত হয়রান দেখাচ্ছে।

খোদেজা — কেন হয়রান দেখাচ্ছে? কী হয়েছে তাঁর? ডাক্তার কী বলল হাশেম?

হাশেম — (দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যেতে যেতে) এখনো জানি না।

হাতেম আলি — (পানি পান করে) হাশেম, আমি পীরসাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, তুমি পাশের ঘরে যাও।

হাশেম — (অধীর হয়ে) কী এমন কথা আপনি পীরসাহেবকে বলবেন আমি শুনতে পারি না?

হাতেম আলি — হাশেম।

বহিপীর — যাও বাবা, বাপের মুখের ওপর কথা কহিও না।

[হাশেম গ্লাস তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়, গিয়ে সটান বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। খোদেজা উঠে এসে পাশে দাঁড়িয়ে আলাপ করে কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না।]

হাতেম আলি — (মেঝের দিকে চেয়ে) পীরসাহেব, আমার মাথার ওপর হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে; চারদিকে আমি অন্ধকার দেখছি। আমার পায়ের তলা থেকেও যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

বহিপীর — কী ব্যাপার, খুলিয়া বলেন। আমাকে বলিতে দ্বিধা করিবেন না।

হামেত আলি — আপনার বহুত মেহেরবানি পীরসাহেব, যে আপনি দুঃখের কথা শুনতে চাবেন, তাতে একটু ভরসা পাচ্ছি। আপনাকে বলে মনের চিন্তা হয়তো লাঘব হবে, হয়তো আপনি আমাকে একটু পথও বাতলে দিতে পারবেন। সত্যি আমি কোনো পথ দেখছি না। এখন কী করে যে নিজের পরিবারের কাছে আর দেশের দশজনের কাছে মুখ দেখাব, জানি না।

বহিপীর — খোদা যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন, আজই তাহার আরেকটি প্রমাণ হাতেনাতে পাইয়াছি। আপনি দিল খুলিয়া সমস্ত কথা আমাকে বলেন।

হাতেম আলি — প্রথমে একটি ব্যাপারে আমি আপনার কাছে মাফ চাই। আমি আপনার কাছে একটা ঝুট কথা বলেছি। বলেছি, আমার শরীর অসুস্থ, দাওয়াই করার জন্য শহরে এসেছি। সে কথা সত্যি নয়, তবে চিন্তায় কদিনে এত কাহিল হয়ে পড়েছি যে রোগশয্যায় আছি বলেই মনে হয়। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই যেন। কিন্তু পীরসাহেব, অসুখের ভান না করে আমার উপায় ছিল না। ব্যাপারটা গোপন রাখব ভেবেই অসুখের ভান করেছিলাম। মুখে দুশ্চিন্তার যে ছায়া পড়েছিল সে দুশ্চিন্তার যুক্তিসঙ্গত কোনো উত্তর ছিল না। ওরা যখন সঙ্গে আসতে চাইল অসুখের কথা শুনে, তখন জোর করে না-ও করতে পারলাম না। একবার ঝুট কথা বললে উপায় নেই, তখন একটার পর একটা বলতে হয়; একবার শুরু হলে তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সবকিছু শেষ হয়েছে, আসল কথাটা আর মিথ্যা কথা দিয়ে ঠ্যাকা দেওয়া যায় না।

বহিপীর — খোদা ইচ্ছা করিলে পড়ন্ত ঘরও ঠ্যাকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা যায়। ভালোমন্দ খোদারই হাতে। বলেন জমিদার সাহেব, বলেন কী ব্যাপার।

হাতেম আলি — আপনাকে বলেছি রেশমপুরে আমার কিঞ্চিৎ জমিদারি আছে। একসময়ে এই জমিদারের নাম ডাক ছিল, তার আয়ও ছিল প্রচুর। কিন্তু সেই সুদিন আমার জমানার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার হাতে যে জমিদারিটা এলো তা কেবল ঢাকের ঢোল বাজালে আওয়াজ হয়, কিন্তু ভেতরে অন্তঃসারশূন্য, দেখতে বড় কিন্তু ভেতরে ফাঁকা। তবু তা থেকে যৎসামান্য যা আয় হয়ে উঠত তাই দিয়ে কোনো প্রকারে মানমর্যাদা রেখে ভরণপোষণ চলত। কিন্তু সে জমিদারিও সান্ধ্য আইনে পড়ে নিলামে উঠতে বসেছে। কালই নিলামে উঠবে।

বহিপীর — সবই খোদার ইচ্ছা, খোদাই দুনিয়ার মালিক।

হাতেম আলি — আমার আশা ছিল, আমি কোনো প্রকারে যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারব, শেষ পর্যন্ত জমিদারি নিলামে চড়াটা বন্ধ করতে পারব। সে আশা নিয়েই আমি শহরে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিন আমাকে সাহায্য করবেন, সেখানে আমাকে নিরাশ হতে হলো। আনোয়ারউদ্দিন বলে দিলেন তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। পীরসাহেব, জমিদারি আর বাঁচানো যাবে না, এবার সে জমিদারি যাবেই! আমি দেউলে হব, আমার পরিবার দেউলে হবে; আমার সবকিছু উচ্ছন্নে যাবে। (থেমে) আর কথাটা লুকিয়ে রাখি কী করে? এবার আমি কীই বা করি! (থেমে) আমার ছেলেটি কত আশা করেছিল যে তাকে ছাপাখানা কেনার টাকা দেব, এবার তার সাধের স্বপ্নও ভাঙবে।

বহিপীর — আহা জমিদার সাহেব, এত বেচইন হইয়া পড়িবেন না, খোদার উপর তোয়াক্কা রাখুন। দুনিয়াটা মস্ত এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। খোদা কাকে কীভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

হাতেম আলি — (হঠাৎ রেগে) পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা। আমি কী অন্যায় করেছি, আমার বিবি সাহেব ও আমার ছেলেই বা কি অন্যায় করেছে?

বহিপীর — জমিদার সাহেব। দুঃখে সংবিৎ হারাইবেন না।

হাতেম আলি — (নাক ঝেড়ে ক্রন্দন সম্বরণ করে) না না মানসম্মান সম্পত্তি সবই যখন গেল, তখন কী আর মাথা হারালে চলে? ভাববার বুঝবার শক্তিও যদি যায়, তবে থাকবে কী, কিন্তু আমার মনে শক্তি কোথায়? পীরসাহেব, এবার আমি কী করব?

বহিপীর — ধৈর্য ধরুন জমিদার সাহেব। এই মুহূর্তে ইহা ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু আপনাকেও আমার একটি জরুরি কথা বলার আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনার এই

নিদারুণ বিপদের সময়ই আমাকে এই কথা বলিতে হইতেছে। যদি পারেন, একটু মনোযোগ দিয়া আমার কথা শ্রবণ করুন।

হাতেম আলি — (নিস্তেজ গলায়) বলুন!

বহিপীর — শীঘ্রই শেষ করিব, দেরি হইবে না বলিতে। গোড়া হইতে বলি। আপনি যেমন আমার নিকট হইতে একটি কথা লুকাইয়াছেন, তেমনি আমি একটি কথা আপনার নিকট হইতে লুকাইয়াছি। আমার এই যাত্রার আসল উদ্দেশ্য আপনাকে বলি নাই, আমার উদ্দেশ্য এখন হাসিল হইয়াছে, তাই বলিতে তো বাধা নাই। উপরন্তু আপনি ব্যাপারটার সহিত জড়িত আছেন বলিয়া আমাকে বলিতেই হইবে। না হইলে আপনার এই দুঃখের সময় কথাটা পাড়িতাম না।

হাতেম আলি — আমি জড়িত? কীভাবে পীরসাহেব?

বহিপীর — অতি আশ্চর্য; কিন্তু উহা সত্য। ব্যাপারটা হইতেছে এই; গত জুম্মা রাতে তাহেরা বিবি নামে একটি বালিকার সঙ্গে আমার শাদি মোবারক সম্পন্ন হয়। তিনি আমার এক পেয়ারা মুরিদের কন্যা। অত্যন্ত হাউস করিয়া তিনি আমার সহিত তাঁহার কন্যার শাদি দিয়াছিলেন। তিনিই কথা পাড়িয়াছিলেন। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, নেক পরহেজগার মানুষঃ বিষয়-আশয় তেমন না থাকিলেও বংশ খান্দানি। আমারও বয়স হইয়াছে, দেখভাল করিবার জন্য আর খেদমতের জন্য একটি আপন লোকের প্রয়োজন আছে। আমার প্রথম স্ত্রীর এন্তেকাল হয় চৌদ্দ বৎসর আগে। আমি পুনর্বার শাদি না করিয়া খোদার এবাদত আর মানুষের খেদমতই করিয়াছি। আমার সন্তান-সন্ততিও নাই, দেখাশুনা করিবার জন্য এক হকিকুল্লাহ্ আছে। কিন্তু সে আর কত করিতে পারে। দেখিলাম, বিবাহ্ করাটাই সমীচীন হইবে। অতএব আমি নিমরাজি হইতেই বাকি কার্যের ভার আমার পেয়ারা মুরিদ নিজের হাতেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিবাহের রাতেই এক অত্যাশ্চর্য ইসানে গারের-মামুলি কাণ্ড ঘটিল। আমার বিবি যাঁহাকে তখনো আমি দেখি নাই–একটি নাবালেগ চাচাতো ভাইকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন। বাড়িতে হুলুস্থুল পড়িল। আমার মুরিদের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যে তাঁহার ইহাতে কোনো কসুর নাই, তাঁহার কন্যার ব্যবহারের জন্য তাহাকে দোষারোপ করা যায় না, অবশ্য তাহার যে দোষ নাই সে কথা বলাও সঠিক হইবে না। পুত্র-কন্যার শিক্ষাদীক্ষার ভার পিতা-মাতার উপরেই। সে শিক্ষাদীক্ষার গাফিলতি হইলে দোষটা পিতামাতার ঘাড়েই পড়ে। সে কথা যাক। আমার মুরিদ অধীর হইয়া পুলিশে পর্যন্ত খবর দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাতে আমি মত দিলাম না। পুলিশ নিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে জানাজানি হইবার সম্ভাবনা; উহা কেই বা চায়। আমি বলিলাম, অমিই খুঁজিতে বাহির হইব। সেই রাতেই হকিকুল্লাহ্কে সঙ্গে করিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠিক পথই ধরিয়াছিলাম এবং এতক্ষণ তাঁহাকে ধরিতেও পারিতাম যদি কদমতলা না গিয়া ডেমরা যাইতাম, কিন্তু কী বলিব, ভুলটা খোদাই শোধরাইয়া দিলেন আপনার বজরার সঙ্গে আমার নৌকার সংঘর্ষ ঘটাইয়া। কারণ, ডেমরার ঘাট হইতে আপনি আমার বিবিকে তুলিয়া লইয়াছেন। এখন তিনি পাশের কামরাতেই অবস্থান করিতেছেন।

হাতেম আলি — পাশের ঘরে? আহ্! আমার মাথাটার কী হয়েছে। দুশ্চিন্তায় পড়ে তাঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, কাল ডেমরার ঘাটে আমার বিবি একটি মেয়েকে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি আপনার বিবি?

বহিপীর — সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি জানেন তিনি কে, কোথায় বাড়ি কী তাঁর নাম?

হাতেম আলি — জি না। মনের চিন্তায় ছিলাম, ও কথা জিজ্ঞাসা করার খেয়াল হয়নি।

বহিপীর — হুঁ। না, আমার মনে কোনোই সন্দেহ নাই যে যাঁহাকে আপনারা কাল ডেমরার ঘাট হইতে তুলিয়া লইয়াছেন তিনিই আমার পলাতকা বিবি। কিন্তু তবু সাবধানের মার নাই। কথাটা একটু গওর করিয়া দেখুন। শুনিতেছেন তো জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি — (একটু ঘুরে বসে বহিপীরের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে) মনে শান্তি নাই পীরসাহেব, কিন্তু শুনছি আপনার কথা।

বহিপীর — যাহা বলিতেছিলাম। আমি তাঁহাকে কখনো দেখি নাই। আপনারাও তাঁহাকে চেনেন না। তিনি ঘর ছাড়িয়া আমার ভয়ে পালাইয়া আসিয়াছেন। কাজেই আমি বলা মাত্র তিনি যে সুড়সুড় করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আসিবেন, সে কথা ভাবা অনুচিত হইবে। সুযোগ পাইলে তিনি আমাকে ফাঁকি দিবার ফন্দি-ফিকির নিশ্চয়ই বাহির করিবেন। অতএব, তিনি যদি আত্মপরিচয় ঢাকিয়া রাখেন তাহা হইলে প্রমাণাদি ব্যতীত তাহাকে আমার বিবি বলিয়া দাবি করা মুশকিল হইতে পারে। আপনার এখানে তিনি একাই আছেন, তাহার চাচাতো ভাইটি নাই। সে থাকিলে কোনো চিন্তা ছিল না। সেই নিশানাটি হারাইয়াই তো মুশকিল হইয়াছে। তবে একটা ভরসা। বলিলে নিজেরই ক্ষতি হইবে জানিয়াও স্ত্রীলোক কখনো পেটে কথা চাপিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষ করিয়া আপনাদের সঙ্গে আমার যখন কোনোই যোগাযোগ ছিল না, তখন হয়তো বা তিনি আপনার স্ত্রীর নিকট নিজের আত্মপরিচয় ঢাকিয়া রাখেন নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সন্দেহ না জানাইয়া সে কথাটা প্রথমে যাচাই করিয়া লইতে চাই। আপনার ছেলে সে ঘরেই বড় বেশি ঘুরঘুর করিতেছে। সেও জানিয়া থাকিতে পারে। প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়? জমিদার সাহেব! অত বেহুঁশ হইয়া পড়িলে কি হইবে?

হাতেম আলি — (জেগে উঠে) না না। বেহুঁশ হয়ে পড়েছি কোথায়। বলুন পীরসাহেব।

বহিপীর — (সুর বদলে) ধৈর্যহারা হইবেন না জমিদার সাহেব। দুনিয়াটা সত্যি কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। কিন্তু দেখিতেছেন না এই বজরাতে ভাগ্যের কেমন অত্যাশ্চর্য লীলাখেলা চলিতেছে? ইহা সবই খোদার ইঙ্গিতে হইতেছে। আপনি বুকে সাহস ধরুন; আপনার সমস্যারও সমাধান হইবে! জমিদার সাহেব, আপনার ছেলেকে একটু ডাকিবেন?

হাতেম আলি — জি। হাশেম! (পাশের কামরা থেকে উঠে ক্ষিপ্রগতিতে হাশেম এ কামরায় এসে হাজির হয়) হাশেম। পীরসাহেব তোমাকে ডেকেছেন।

বহিপীর — বাবা হাশেম, তোমাকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। কাল ডেমরার ঘাটে একটি বিবাহিতা তরুণীকে বিপন্না অবস্থায় দেখিয়া তোমাদের বজরায় ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছ। তাঁহার পরিচয় কি তিনি তোমাদের বলিয়াছেন।

হাশেম — (ইতস্তত করে) বোধ হয় বলেছেন। আমি ঠিক জানি না।

বহিপীর — তাঁহার পরিচয় জানা আমার বিশেষ প্রয়োজন। আপনি ভিতরে যান, আর কথায় কথায় তাঁহার পরিচয় জানিয়া লউন। আমি যে জানিতে চাই তাহা অবশ্য বলিবেন না।

হাশেম — জি আচ্ছা। (হাশেম ভেতরে যায়, গিয়ে দরজা ধরে চুপচাপ ভাবিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।)

খোদেজা — হাশেম, কী হয়েছে তোর আব্বার?

হাশেম — কিছু বুঝতে পারছি না। আব্বা পীরসাহেবের সঙ্গে কী আলাপ করলেন তাও জানি না। কিন্তু এখন তিনি ওঁর (ইঙ্গিতে তাহেরাকে দেখিয়ে) পরিচয় জানতে চান। তার অর্থ হলো এই যে, তাঁর কথা তিনি সঠিকভাবে পুরোপুরি জানেন না। (ভেবে) ব্যাপারটা বুঝেছি। (হঠাৎ মাথার কাছে উবু হয়ে বসে) আম্মা! পীরসাহেব তাঁকে কখনো দেখেননি। তিনিই যে তাঁর বিবি সে কথাও ঠিক জানেন না। একটি মেয়েকে ডেমরার ঘাট হতে তুলে আমরা আশ্রয় দিয়েছি, সে কথাই শুধু

জানতে পেরেছেন। যদি আমরা তাঁকে তাঁর সঠিক পরিচয় না বলি, তবে তিনি জানতেই পারবেন না যে তিনিই তাঁর বিবি। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে পীরসাহেবকে তাঁর পরিচয় বলি না।

খোদেজা — হাশেম। এ কী করে সম্ভব! তোর কি মাথা খারাপ হলো নাকি? এই মেয়েটা তোর মাথা খেলো নাকি?

হাশেম — (উঠে দাঁড়িয়ে) মাথা খাবে কেন? কিন্তু আমরা কি তাঁকে এইটুকু সাহায্য করতে পারি না? আপনি এই কথা বুঝতে পারছেন না যে আমরা যদি তাঁকে সাহায্য না করি তবে তাঁর জীবনটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আম্মা, আমি পীরসাহেবকে গিয়ে বলছি যে তিনি আমাদের তাঁর আত্মপরিচয় দেননি। আমরা জানি না কোথায় তাঁর বাড়ি, কী তাঁর নাম।

খোদেজা — হাশেম। তোর হয়েছে কী? কী চাস তুই?

হাশেম — (দ্রুত মাথা নেড়ে) না, আমি কিছুই চাই না। শুধু তাঁকে বাঁচাতে সাহায্য করতে চাই।

খোদেজা — যার সঙ্গে পীরসাহেবের ন্যায্যমতো বিয়ে হয়েছে তাকে তুই বাঁচাবার কে?

হাশেম — আম্মা! আমি তাঁকে বাঁচাবই। তাঁকে বিয়ে করে হলেও বাঁচাব। আম্মা শুনছেন।

খোদেজা — তুই কি সত্যিই এই চাস যে পীরসাহেবের বদ্‌দোয়া নিয়ে সংসারে আগুন ধরিয়ে দিই? পীরের দোয়ার জন্য মানুষ কি-না করে আর তুই একটি অচেনা-অজানা মেয়ের জন্য সজ্ঞানে মাথায় বদ্‌দোয়া ডেকে নিবি? না, আমিই বলব। তুই যদি না বলিস তবে আমিই নিজেই বলব। (ক্ষিপ্রভঙ্গিতে উঠে পড়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে) পীরসাহেব, আপনার বিবি আমার সঙ্গেই আছেন।

হাশেম — আম্মা।

বহিপীর — শোকর আল্‌হামদোলিল্লাহ!

[তাহেরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হাশেম বিস্ময়াভিভূত। শুধু জমিদার সাহেব নিস্তেজভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন।]

[পর্দা নামবে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

(স্টেজ পূর্ববৎ, কিন্তু বজরাটা ছাড়া সবকিছু রাতের অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে ছিটেফোঁটা তারা।]

দুই কামরাতেই লণ্ঠন জ্বালানো আছে। বাইরের ঘরে মোড়ার ওপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে হাতেম আলি। চোখের পাতা পড়ে না; দৃষ্টি ভাবনায় নিমজ্জিত। বেঞ্চিতে চাদর গায়ে বসে বহিপীর তসবি টেপেন আর ঘন ঘন ভেতরে দরজার দিকে তাকান। তাঁর পরনে রঙিন আলখাল্লা আর পায়জামা।

পাশের কামরায় হাশেম অস্থিরভাবে পায়চারি করে। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোনাজাত করে নামাজ শেষ করে খোদেজা পান বানাতে বসেন। ওধারে বেঞ্চিতে পিঠ খাড়া করে বসে তাহেরা; তার নড়ন-চড়ন নেই আর দৃষ্টি মেঝের ওপর নিবদ্ধ।

বাইরে আবছায়ার মধ্যে বসে হকিকুল্লাহ্ হুঁকা খায়। একটু দূরে চাকরটি আর মাঝি দুজন আধ-শোয়া অবস্থায় গাল-গল্প করে।]

হাতেম আলি — সারা বিকাল, সারা সন্ধ্যা কাটল আশায় আশায় যে বাল্যবন্ধু আনোয়ার আসবে। ভেবেছিলাম, সাহায্য করতে পারবে না বলে থাকলেও চিরদিনের বন্ধুত্বের খাতিরে শেষে কোনো প্রকারে টাকা জোগাড় করে বাল্যবন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আসবে। কিন্তু সে এলো না। (থেমে) আর একটা রাত। এত দিনের পুরনো জমিদারির শেষরাত। আমার ছেলে আর তার মা এখনো জানে

না যে এইটেই তাদের জমিদারির শেষ রাত। তাদের এখনো বলতে পারিনি! এখনো কি মনে আশা আছে? আর কিসের আশা?

বহিপীর — (কিছুটা বিরক্তভাবে) খোদার কথা খেয়াল করুন জমিদার সাহেব। বিলাপ করিয়া কী হইবে?

হামেত আলি — তাই। বিলাপ করে কী আর হবে। তাতে রাতের গায়ে তো আর আঁচড় পড়বে না, অন্যান্য রাতের মতো এই রাতও একসময়ে শেষ হয়ে যাবে। যাক যাক, শেষ হয়ে যাক।

বহিপীর — (দরজার দিকে তাকিয়ে) হাশেম বাবা ফিরে না কেন?

হাতেম আলি — (হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সামান্য রুক্ষতার সঙ্গে) পীরসাহেব, আপনি আছেন আপনার খেয়ালে। এক বিবি গেলে আপনি আরেক বিবি আনতে পারেন। কিন্তু আমার জমিদারি একবার গেলে আর ফিরে আসবে না? একবার সর্বস্বান্ত হলে আমি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। এখন আমি সর্বস্বান্ত হতে বসেছি। বুকে আর এতটুকু সাহস নাই। বিবি আর ছেলেকে যে কথাটা খুলে বলব, সে সাহস পর্যন্ত পাচ্ছি না।

বহিপীর — দেখুন, খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা। যার তকদিরে যত রিজিক ধার্য করা আছে, সে তাহার বেশি ভোগ করিতে পারে না। সে রিজিক ধীরে ধীরে ভোগ করিলে ভোগের সময় দীর্ঘ হইবে; দ্রুত খাইয়া ফেলিলে শীঘ্র তাহা শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তবু খোদা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করেন। যাহাকে একেবারে নিঃস্ব মনে হয় তাহারও কিছু না কিছু থাকে। আর কিছু না থাকিলেও রুহানিয়াৎ তো থাকিতে পারে। না, কেউ কখনো একেবারে নিঃস্ব হয় না।

হাতেম আলি — (যেন বোঝে) ঠিক কথা বলেছেন পীরসাহেব, কেউ একেবারে নিঃস্ব হয় না। কেবল সব সময়ে বুঝে ওঠে না। বুঝি, তবু যেন বুঝি না।

বহিপীর — সে কথা না বুঝিলেও আমার সমস্যা সম্বন্ধে খোঁটা দিয়া একটি কথা বলিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু আমার কথাটাও একবার বুঝিবার চেষ্টা করুন। আপনার মনে হইতে পারে যে, যে বিবিকে আমি চোখে পর্যন্ত দেখি নাই বা যাঁহার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য মিলিত হই নাই, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কেন এত প্রচেষ্টা। মানুষ সময়ের দীর্ঘতা দিয়াই সব বিচার করে, কিন্তু তাহা ভুল। একবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই সে দায়িত্ব পালন করা একান্ত ফরজ হইয়া পড়ে। সময়ের স্বল্পতার কথা বলিয়া সে দায়িত্বের ভার হইতে নিজেকে মুক্ত করা যায় না। এক মুহূর্তের স্ত্রীর প্রতি যেমন দায়িত্ব, দশ বছরের স্ত্রীর প্রতিও সেই সমান দায়িত্ব। কাজেই, আমার বিবির সহিত চোখাচোখি পর্যন্ত না ঘটিয়া থাকিলেও শাদি মোবারক যখন একবার সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহার প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। দশ বছরের বিবিও হঠাৎ ভুলবশত কোনো তরিকাবিহীন কাজ করিয়া বসিলে আমার যেমন কর্তব্য হইত তাঁহাকে বিপথ হইতে সপথে আনা, এই বিবির প্রতিও আমার সেই সমান কর্তব্য। (থেমে গলা নিচু করে) জমিদার সাহেব আবার বেঁহুশ হইয়া পড়িয়াছেন : তাঁহার কর্ণকুহরে কিছু প্রবেশ করিতেছে না। বৃথা বকা। কিন্তু হাশেম বাবা ফিরে না কেন। ঐ কামরায় একবার ঢুকিলে সে যেন জোঁকের মতো লাগিয়া থাকে, অত আকর্ষণ কিসের? (গলা উঁচিয়ে) হাশেম মিঞা।

হাশেম — পীরসাহেব আবার ডাকছেন। সারা দুপুর আর সারা বিকাল ধরে এ-কামরা সে-কামরা করছি, আর ভালো লাগে না। কত মতলবই না তিনি ঠাওরালেন, কত কথাই না বললেন। আর আমি যেন বার্তাবাহক। যেন যুদ্ধক্ষেত্রে শর্ত-পাল্টা শর্তের কথা নিয়ে দুই জোরদার শত্রু-শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করছি। কিন্তু বার্তাবাহককে যে দলহীন হতে হয়। কোনো দলের প্রতি একটু টান থাকলে আর ঘটনাপ্রবাহ তার অনুকূল না হলে তার পক্ষে নির্বিকার থাকা মুশকিল। আমার সত্যিই আর ভালো লাগছে না।

তাহেরা — (সামান্য অভিমানের সুরে) আপনার এ গোলমাল ভালো না লাগলে আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমিই পীরসাহেবকে বলব।

হাশেম — না না; আমি কি আর সে ধরনের ভালো না লাগার কথা বলেছি। তবে মনে হয়, পীরসাহেবের মতো অত ধৈর্য আমার নাই। যখন আম্মা দরজা খুলে আপনার কথাটা পীরসাহেবকে বলে দিলেন, তখন ভাবলাম, এখুনি কিছু একটা ঘটে যাবে। কিন্তু পীরসাহেব সাবধানী লোক। সজোরে শোকর আদায় জানিয়ে সংযত হয়েই থাকলেন, খাওয়া-দাওয়া করলেন, তারপর একটু বিশ্রামও করলেন। এমন একটা ভাব যেন কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সবই ঠিকঠাক আছে, তিনি কেবল সস্ত্রীক কুটুম্ব বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। আসলে বেড়ালের ভাব, ইঁদুরকে থাবার নিচে পেয়ে বিড়ালের যে ভাব হয়, সেই ভাব।

খোদেজা — হাশেম।

হাশেম — (কান না দিয়ে) তারপর ধীরেসুস্থে প্রস্তাবনা শুরু হলো এ-কথা সে-কথা, পীরসাহেব তাঁকে ঝেড়ে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। তাঁর বিবির কাঁধে যে শয়তান চড়েছে সে শয়তানকে ঝেড়ে নামিয়ে দেবেন। কিন্তু সব কথাতেই তাঁর বিবি কেবল না করেন। পীরসাহেব সব শোনেন আর মাথা নাড়েন। কিন্তু দেখে মনে হয় তাঁর চোখটা যেন হিংস্র জন্তুর মতো দপ করে জ্বলে ওঠে।

খোদেজা — (রেগে) হাশেম এখানে বসে এত বেতমিজি কথা শুনতে পারি না। পীরসাহেবকে নিয়ে এসব কী কথা বলিস। দিলে কী একটু ভয়-ডর নাই?

হাশেম — আছে আম্মা, ভয়-ডর আছে! না হলে কি একটি মেয়ে এমন করে পালায়? আর আমিই কী কেবল বার্তাবাহকের মতো এ-কামরা সে-কামরার মধ্যে ঘুরঘুর করি?

খোদেজা — তোর এত ঘুরঘুর করার কোনোই প্রয়োজন দেখি না। তাহেরা যা বলছে তাই পীরসাহেবকে গিয়ে বল। শুনে তাঁর যা খুশি তা-ই তিনি করবেন।

হাশেম — (বিরক্ত হয়ে) বলব আম্মা, বলব । তবে সুখবর যখন নয়, অত লাফিয়ে গিয়ে বলবারই কী প্রয়োজন? তাছাড়া ব্যাপারটা কেমন সঙ্গীন হয়ে উঠছে দেখতে পারছেন না? প্রথমে আদর-আবদার, মিষ্টি মিষ্টি কথা, তাতে কোনো ফল না হওয়ায় এখন উঠেছে পুলিশের কথা। তিনি সঙ্গে না গেলে পীরসাহেব পুলিশে খবর দেবেন, তাঁর বাপজানকে খবর দেবেন। কিন্তু তাতেও তাঁর বিবি ভয় পাচ্ছেন না। বলছেন, জুলুম করে কোনো ফল হবে না। জুলুম করলে তিনি সত্যি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, না হয় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবেন।

খোদেজা — (রেগে আপন মনে) ঐ এক কথা, আত্মহত্যা করব । মেয়েটার ঘাড়েই শুধু শয়তান বসে নাই, তার ভিতরেও শয়তান। আর সে শয়তান তোর ঘাড়েও যেন চেপেছে।

হাশেম — কার ঘাড়ে শয়তান চেপেছে কে জানে। এই বুড়ো বয়সে একজন মেয়ের পেছনে ছোটার নেশা কি এমনিতেই হয়?

খোদেজা — হাশেম, হাশেম। আমার সামনে এসব কী বেয়াদবি।

হাশেম — আম্মা, একটা কথা বুঝে দেখবেন। পীরসাহেবের সঙ্গে তাঁর যে বিয়ে, সে বিয়ে কেবল নামেই বিয়ে। তিনি হ্যাঁ বলেন নাই। কোনোভাবে মতও দেন নাই।

খোদেজা — তোর বাপের সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন আমিই কি আর হ্যাঁ বলেছিলাম? বিয়ের ব্যাপার কি আইন-মকদ্দমা নাকি?

হাশেম — আইন-মকদ্দমা নয় বলেই তো এত কথা উঠেছে। আপনি হ্যাঁ বলেননি লজ্জায়, আর উনি হ্যাঁ বলেননি মত ছিল না বলে। মত না থাকলে কোনো বিয়ে জায়েজ হতে পারে না, এ বিয়েও

জায়েজ হয়নি। যদি জায়েজ হতো, যদি তিনি পীরসাহেবের ঘর-সংসার করে পালিয়ে যেতেন তাহলে পীরসাহেবের পক্ষ নিয়ে কথা বলাটা হয়তো যুক্তিসঙ্গত হতো। সে কথা যাক, কিন্তু তাঁর প্রতি একটু দয়া-মায়াও কি হয় না আপনার। কাল যাঁকে আদর করে ডেকে নিয়ে আশ্রয় দিলেন, যে আজ সারা দিন আপনার সাথে থেকে রান্নাবান্নার কাজ করলো, যাঁর চুলও বেঁধে দিলেন মগরেবের আগে, তাঁর ওপর একটু মমতাও হয়না?

খোদেজা — (হঠাৎ ভিন্ন গলায়) মমতা হলেই বা কী করব? মমতা তো হয়ই। আমার মেয়ে নেই। ও যে সারা দিন আমার পাশে বসে টুকটাক কাজ করল তা বেশ ভালোই লাগল। কিন্তু তার কপাল খারাপ, আমরা কী করতে পারি? পীরসাহেব যদি না আসতেন, তবে অন্য কথা ছিল। তিনি পাশের ঘরেই আছেন। তিনি এ কথাও জানেন যে, তাঁর বিবি এখানে আছে। তার ওপর তিনি এও চাইছেন যে তাঁর বিবি তাঁর সঙ্গে যেন ফিরে যায়। তোকে বারবার বলেছি, পীরসাহেবকে অসন্তুষ্ট করে তাঁর বদ্‌দোয়া মাথায় নিতে আমি রাজি নই। তা ছাড়া আমাদের করারও আর কিছুই নাই। ও যা বলেছে পীরসাহেবকে গিয়ে বল। তিনি পুলিশ ডাকুন বা তার বাপকে খবর দিন তা তাঁর মর্জি।

বহিপীর — হাশেম মিঞা। কোথায় গেলেন হাশেম মিঞা (হাশেম আর দ্বিরুক্তি না করে পাশের ঘরে চলে যায়।)

হাশেম — পীরসাহেব, তিনি ঐ একই কথা বলছেন। বলছেন যে পুলিশ ডাকলে বা তাঁর বাপকে খবর দিলে তিনি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবেন। কেউ নাকি ঠেকাতে পারবে না।

বহিপীর — হু! (ভাবিত হন। তারপর) দেখুন। মধ্যের দরজাটা একটু খুলিয়া দিন আমিই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করি। আপনি সে ঘরে গিয়া কী করেন বুঝি না। (হাশেম দরজাটা সামান্য খুলে দেয়। পীরসাহেব একটা মোড়া টেনে নিয়ে দরজার কাছে বসেন।)

বিবি সাহেব–

তাহেরা — (বাধা দিয়ে উচ্চ স্বরে) আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিই নাই। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

বহিপীর — (একটু রেগে) আপনি মত না দিলেও আপনার বাপজান দিয়াছেন। তাহা ছাড়া সাক্ষী-সাবুদ সমেত কাবিননামাও হইয়া গিয়াছে। এখন সে কথা বলিলে চলিবে কেন। (সুর বদলিয়ে) দেখুন, মন দিয়া আমার কথা শুনুন।

তাহেরা — (আবার বাধা দিয়ে) আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার বাপজান আর সৎমা আপনাকে খুশি করার জন্য আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন কোরবানির বকরি। আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাব না। আপনি আমাকে দেখেননি, আমিও আপনাকে দেখিনি। আর আপনাকে আমি দেখতেও চাই না।

খোদেজা — খোদা খোদা, কোথায় যাব আমি। পীরসাহেবের মুখের ওপর এসব কী কথা বলে মেয়েটা! শুনেই আমার বুকের ভেতরটা কাঁপে।

বহিপীর — আমার কথা শোনেন।

তাহেরা — না না, আপনার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।

বহিপীর — (হঠাৎ রাগে আত্মহারা হয়ে) হকিকুল্লাহ্! হকিকুল্লাহ্! (হকিকুল্লাহ্ দ্রুতপায়ে ভেতরে আসে।) যাও, পুলিশ ডাকিয়া লইয়া আসো। বহুত আদর-আবদার হইয়াছে, আর নয়। আমার মান-সম্মান যাক, তবু পুলিশ ডাকিয়া আনো। ঘাটে পুলিশ আছে, যাও হকিকুল্লাহ্ তাদের ডাকিয়া নিয়া আসো।

হকিকুল্লাহ্ — জি হুজুর, এই ডেকে আনি।

(পরমুহূর্তেই বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চিৎকার শুনে চাকরটা আর দুজনে উঠে বসে।)

হাশেম — পীরসাহেব। পুলিশ ডাকতে পাঠিয়ে ভুল করলেন, পীরসাহেব।

[পাশের ঘরে তাহেরা হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে উঠে পড়ে ঘরে গিয়ে বেঞ্চিতে হাঁটু গেড়ে বসে জানলা দিয়ে গলা বের করে দিতেই খোদেজা লাফিয়ে উঠে দুহাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরেন।]

খোদেজা — হাশেম। এ যে গেল, গেল মেয়েটা, আমি আর তাকে ধরে রাখতে পারছি না।

[হাশেম ধা করে পীরসাহেবকে ডিঙিয়ে পাশের ঘরে যায়, গিয়ে তাহেরার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসে। পীরসাহেব ত্বরিত গতিতে উঠে দরজার সামনে দাঁড়ান, চোখ তাঁর বিস্ফারিত। চিৎকার শুনে হকিকুল্লাহ্ও দ্রুতপায়ে পীরসাহেবের পেছনে এসে দাঁড়ায়।)

বহিপীর — হাশেম বাবা, আপনি তাঁর হাত ছাড়িয়া দিন। আমার বিবির গায়ে হাত দিবেন না।

হাশেম — (রুক্ষ স্বরে) হাত না দিলে তাঁকে বাঁচাত কে? (হাত ছেড়ে দেয়।)

খোদেজা — খোদা খোদা, আমার মাথা ঘুরছে। (হকিকুল্লাহ্র দিকে চোখ পড়ায়) ও কে আবার উঁকি মারছে। কী হচ্ছে এই বজরায়? উনি কোথায় গেলেন?

হকিকুল্লাহ্ — (কেশে) আমি হকিকুল্লাহ্, হুজুরের লোক।

বহিপীর — (ঘুরে দাঁড়িয়ে) হকিকুল্লাহ্। তুমি যাও নাই পুলিশ ডাকিতে? জিব্রাইলের মতো আমার কাঁধের উপর দাঁড়াইয়া এখানে কী করিতেছ? না না এ কী হইল; কেহ কোনো কথা শুনিতেছে না। (সরে গিয়ে হতাশভাবে পীরসাহেব বেঞ্চিতে বসেন।)

হকিকুল্লাহ্ — (সরে গিয়ে) ছোট মুখে বড় কথা, কিন্তু আমি একটু ভাবছিলাম হুজুর।

বহিপীর — (বিস্ময়ে) ভাবিতেছিলে? তুমি ভাবিতেছিলে?

হকিকুল্লাহ্ — জি। ভাবছিলাম, আপনি হয়তো রাগের মাথায় পুলিশ ডাকার কথা বলেছেন। ডেকে ফেললে পরে না আফসোস করেন।

বহিপীর — না না ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না। হকিকুল্লাহ্ পর্যন্ত ভাবিতে শুরু করিয়াছে, যাক, ভালোই করিয়াছ, ইহা পুলিশের ব্যাপার নহে। পুলিশ কীই বা করিতে পারে। হকিকুল্লাহ্, একটু হাওয়া করো। মাথাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে।

(হকিকুল্লাহ্ পাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু করে।)

হাতেম আলি — (হঠাৎ জেগে উঠে) চারপাশে কী হচ্ছে? কিসের এত চেঁচামেচি?

বহিপীর — (মুখ চিবিয়ে) কী আবার হইবে। একটু হাওয়া খাইতেছি।

তাহেরা — (বাহুতে হাত বোলাতে-বোলাতে) আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন।

খোদেজা — ব্যথা দিয়েছে ভালো করেছে। ও না এসে তোমাকে ধরলে কে বাঁচাত তোমাকে? মেয়ে আবার পানিতে ঝাঁপ দিতে চায়। শাবাশ মেয়ে।

তাহেরা — আমাকে বাঁচানোর জন্য আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন?

হাশেম — (রেগে) চোখের সামনে মরতে দেখব নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

তাহেরা — বুঝেছি। আপনারা কোরবানির গোস্ত খেতে পারেন, কিন্তু গরু জবাই চেয়ে দেখতে পারেন না। আপনারা ভেবেছেন সত্যি সত্যি আমি পানিতে ঝাঁপ দিতাম? নিজের জান দেওয়া কি অতই সোজা? আপনাদের বুদ্ধি নাই।

খোদেজা — খোদা খোদা। এবার মেয়েটির মুখে অন্য কথা শুনি। বলে কিনা আমাদের বুদ্ধি নাই।

হাশেম — আপনি বুঝতে পাছেন না আম্মা। তিনি এখন আমাদের রাগাতে চান।

তাহেরা — আপনাদের রাগিয়ে আমার লাভ কী, আপনারা ছেড়ে দিলে আমি যাব কোথায়? (সে বাহুতে হাত বোলাল আর একবার তির্যক দৃষ্টি হাশেমের দিকে তাকায়।)

খোদেজা — (দুজনের দিকে তাকিয়ে) এসব আবার কী হেঁয়ালি চলছে। হাশেম। তুই এখানে এত ঘুরঘুর করিস না তো। বাপের খোঁজখবর নেওয়া নাই, এ ঘরে জোঁকের মতো লেগে আছে। দ্যাখ তোর বাপের কী হয়েছে। বজরায় এত হুলস্থুল, তবু তার কোনো সাড়াশব্দ নাই।

হাশেম — আম্মা, আমি যাচ্ছি কিন্তু আগে আমার একটা কথা শোনেন। পীরসাহেব পাশের ঘরে চুপচাপ বসে। এখন এবাদত করতে বসেননি; তিনি নতুন ফন্দি-কৌশল ভাবতে বসেছেন। কীভাবে তাঁকে নিয়ে যাবেন, কী চাল চাললে তিনি আর ফসকে যাবেন না, সেসব চিন্তা করছেন।

খোদেজা — তোর মুখের কথাও যেন লাগামছাড়া হয়েছে। নিজের বিবিকে কীভাবে বশে আনবেন সে কথা নিয়ে চিন্তা করলে ফন্দি-কৌশল আঁটা হয় বুঝি।

হাশেম — সেটা অন্য কথা! আমি বলতে চাই যে, যতই ফন্দি-কৌশল আঁটেন না কেন, আমি দেখব যাতে তাঁর কোনো ফন্দি-কৌশল না খাটে, কারণ, ওঁর যদি মত থাকে, তবে আমি তাঁকে বিয়ে করব। কথাটা আপনার সামনেই বললাম।

খোদেজা — বিয়ে, বিয়ে করবি তাকে? এ কী কথা বললি? মেয়েটা তোর মাথা খেল নাকি। খোদা খোদা। আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি, হাশেম। তুই এখান থেকে এক্ষুনি বের হ? এ ঘরে আর আসতে পারবি না। পীরসাহেবকে যা বলবার হয় আমিই বলব। এক পীরসাহেবের বিবি, তাকে নাকি আমার ছেলে বিয়ে করবে। তা ছাড়া কী মেয়ে! যে মেয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে পালাতে পারে সে কী করে ভালো মেয়ে? যা যা, এ কামরা থেকে যা হাশেম।

হাশেম — আপনি বলছেন তিনি পীরসাহেবের বউ কিন্তু দুজন সাক্ষীর সামনে একটা কাগজে কী লেখাপড়া হয়েছে তার কোনোই দাম নাই। সামনে থাকলে আমি এখনই সেটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতাম। আমি পীরসাহেবকে গিয়ে বলছি সে কথা। আমার আর ভয়-ডর নাই। আর আমি কাউকে ভয় করি না।

তাহেরা — আমার তাতে মত থাকবে সে কথা আপনাকে কে বললো?

হাশেম — (হঠাৎ দমে গিয়ে) তাই, তাই। তবে আপনার কাছে সেকথা আমি বলি নাই।

তাহেরা — না বললেও আপনি তাই ধরে নিয়েছেন।

খোদেজা — (বিস্ময়ে) আমার ছেলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে তুমি তাতে মত দেবে না।

তাহেরা — সে কথাও আমি বলি নাই। তবে একজন ঝোঁকের মাথায় কেবল বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যই যদি কাউকে বিয়ে করতে চায়, তবে সে অত সহজেই মত দেবে কেন? ঝোঁক কেটে গেলে আপনার ছেলের মত হতে পারে, তিনি ভুল করছেন।

খোদেজা — (আগের মতো বিস্ময়ে) আমাদের মধ্যে আমার ছেলেটাই তোমার জন্য এত করছে। আর তার কথায় তুমি মত দেবে না?

তাহেরা — (একটু হেসে) হঠাৎ আপনি যেন চাইছেন আপনার ছেলের কথায় আমি মত দিই।

খোদেজা — না না, সে কথা নয়। তোমাদের বিয়ে তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তোমার অকৃতজ্ঞতা দেখে। সে জন্যই কথাটা বলছি।

হাশেম — আম্মা, উনি কোনোই অকৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছেন না। আপনি ওঁর কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমিও যা বলতে চাই তা তাঁকে বোঝানো আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। সব কথা এক মুহূর্তে বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। তিনি যদি মনে করেন আমি ঝোঁকের মাথায় তাঁকে বিয়ে করতে চাইছি সেকথা সত্যও হতে পারে। তা সত্য কি মিথ্যা সে কথা জানতে হলে সময় নেবে। (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) কিন্তু আপনাকে আমি কি সাহায্য করতে পারি না?

তাহেরা — (নরম গলায়) আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না। আপনারা সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন বলেই তো মনে সাহস পাচ্ছি। আপনার আম্মা থেকে থেকে আমাকে কথা শোনাচ্ছেন বটে কিন্তু তিনিও আমাকে সাহায্য করছেন। ইচ্ছা করলে তিনি কি আমাকে বের করে দিতে পারেন না?

খোদেজা — (হৃদয়ে টান পড়া গলায়) হয়েছে হয়েছে এত ঢঙের কথা শুনতে পারি না। হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে বসে ডাকেন, হাশেম, ঐ যে তোর আব্বা তোকে ডাকছেন। তাঁর কথা আমরা সাবাই যেন ভুলেই গেছি। (কঠিন হয়ে) যা হাশেম। আর তোকে বলে রাখছি, ওসব সাহায্যটাহায্যের কথা আমি বুঝি না, বিয়ের কথা তো দূরে থাক। আর এ ঘরেও তোর কোনোই প্রয়োজন নেই। পীরসাহেবকে যা বলার আমিই বলব।

হাশেম — আমার কথাটা খেলোভাবে নেবেন না আম্মা। আমি মন থেকেই কথাটা বলছি।

তাহেরা — (একটু হুকুমের সুরে) যান আপনি পাশের ঘরে। দেখে আসুন আপনার আব্বা কেন ডাকছেন।

খোদেজা — (তাহেরার দিকে চেয়ে) এখন তোমার হুকুমই সে বোধ হয় শুনবে।

হাশেম — (হঠাৎ যেতে যেতে বিরক্তভাবে) যাচ্ছি, যাচ্ছি, আপনার কথা শুনেই যাচ্ছি।
(পাশের ঘরে গিয়ে) আব্বা, আমাকে ডাকছিলেন?

হাতেম আলি — (চমকে উঠে) হ্যাঁ বাবা, তোমাকে ডেকেছিলাম। বসো। তোমাদের কথাটা বলার সময় এসেছে। শুধু একটা রাত; একটা রাত কথাটা ঢেকে রেখে লাভ কী?

হাশেম — (সভয়ে) আব্বা কী কথা বলবেন আপনি। কী কথা আর ঢেকে রেখে লাভ নাই?

হাতেম আলি — অস্থির হয়ো না; অস্থির হয়ে লাভ নাই বাবা। দেখো না আমার মধ্যে সমস্ত অস্থিরতার শেষ হয়েছে। আমার মনে আর কোনো ভয়-আশঙ্কা নাই, কোনো অস্থিরতা নাই। শুধু বড় ক্লান্তবোধ করছি। (থেমে) না, এখন আর বলতে কোনো বাধা নাই। বাবা, তোমাদের কাছে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আমার কোনো অসুখ হয় নাই, দাওয়াই করার জন্যও আমি শহরে আসি নাই। এসেছিলাম জমিদারি রক্ষা করতে।

হাশেম — (বিস্ময়ে) জমিদারি রক্ষা করতে?

হাতেম আলি — হ্যাঁ। কিন্তু রক্ষা করতে পারলাম না। কাল জমিদারি নিলামে উঠবে।

হাশেম — কাল জমিদারি নিলামে উঠবে?

হাতেম আলি — শহরে টাকার জোগাড় করতে এসেছিলাম। জোগাড় হলো না। জমিদারি বাঁচানোর আর কোনো পথ নাই। মধ্যে কেবলমাত্র একটি রাত, তারপর বুদবুদের মতো জমিদারি শূন্যে মিলিয়ে যাবে, আর সজ্ঞানে সুস্থ দেহে আমাকে তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে, করার কিছুই থাকবে না।
[স্তম্ভিতভাবে বাপের মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে হাশেম ধীরপায়ে পাশের কামরায় যায়, গিয়ে বেঞ্চিতে বসে মেঝের দিকে চেয়ে মূর্তিবৎ বসে থাকে। খোদেজা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহেরার চোখেও উৎকণ্ঠা আসে।]

খোদেজা — তোর আব্বা কী বললেন? হাশেম! কথা বলিস না কেন?

হাশেম — কাল আমাদের জমিদারি নিলামে উঠবে।

খোদেজা — নিলামে উঠবে। কেন কেন? (স্তম্ভিত হাশেম এবার দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে।)

তাহেরা — (চমকে উঠে) আপনার ছেলে যে কাঁদছে!

হাশেম — (সংযত হয়ে নাক ঝেড়ে) আমি কী আর জমিদারি যাচ্ছে বলে কাঁদছি নাকি। কান্না এলো আব্বার কথা ভেবে। তাঁর চোখে পানি নাই বটে, কিন্তু দুঃখে বুক নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে।

হাতেম আলি — (উঠে এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে) আমার ছেলেটাকে ছাপাখানা করার পয়সা কখনো দিতে পারব না।

হাশেম — (চেঁচিয়ে) আমি পয়সা চাই না। আমি পয়সাও চাই না, ছাপাখানাও চাই না। [হাতেম আলি আবার নিঃশব্দে ফিরে যান।]

(উঠে পায়চারি করতে করতে আপন মনে) আমার কী আসে যায়। জমিদারি থাক বা না থাক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। পড়াশোনা করেছি, এটা না হয় সেটা হবে, কিছু একটা করে খেতে পারবই। একটা স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারব। কিন্তু আব্বার কী হবে? এই বয়সে কী স্বপ্নই বা তিনি গড়তে পারেন? আশ্চর্য, আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম তাঁর অসুখ হয়েছে। কিন্তু কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাটি না তিনি ভোগ করেছেন যে কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই সে কথা বিশ্বাস করেছি। যে মানসিক যন্ত্রণা দুদিনে শরীরকে ভেঙে দেয় সে মানসিক যন্ত্রণা কঠিন অসুখের চেয়ে কষ্টকর (থেমে মায়ের দিকে তাকিয়ে) আম্মা, কী হবে আব্বার? কী নিয়ে শেষ জীবনটা কাটাবেন?

তাহেরা — কেন, আপনারা থাকবেন আপনি থাকবেন, আপনার আম্মা থাকবেন।

হাশেম — জমিদারি! জমিদারি কী? কত জমিদারি এসেছে-গিয়েছে। আজ মাটি খুঁড়লেও কত কত বিশাল জমিদারির কোনো নিশানা পাওয়া যাবে না। তার তুলনায় আমাদের আর কীই বা ছিল। তাও না হয় আজ যাবে, কী আসে-যায় তাতে। আব্বাকে তাঁর এই শেষ বয়সে সে কথা কে বোঝাবে?

[বহিপীর হঠাৎ উঠে আসেন, এসে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ান]

বহিপীর — বিবি। বহুত হইয়াছে, আর ফ্যাকড়া তুলিবেন না। দেখুন, তাঁহাদের কাহার মনে শান্তি নাই। সকলেই কেমন বেচইন হইয়া পড়িয়াছেন। এই পারিবারিক দুশ্চিন্তার সময় তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিয়া তাঁহাদের আরও কষ্ট দেওয়া ঠিক হইবে না। আসুন, আমরা চলিয়া যাই। ও বিবি।

[তাহেরা তাঁর কথায় কান না দিয়ে পায়চারি করতে থাকা হাশেমের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে।]

(অপেক্ষা করে) হুঁ। [তিনি স্বস্থানে আবার ফিরে যান, গিয়ে গুম হয়ে বসে থাকেন। পাশের ঘরে হাশেম পায়চারি বন্ধ করে হঠাৎ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বেঞ্চির ওপর। মাঝে মাঝে খোদেজা, হাশেম আলাপ করে। সে আওয়াজ শোনা যাবে না।]

হকিকুল্লাহ্। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো ঠেকিতেছে না।

হকিকুল্লাহ্ — জি।

বহিপীর — (রেগে) কী বুঝিলে যে জি বলিলে? যাও তুমি এখন যাও। আমি জমিদার সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলি। (হকিকুল্লাহ্র প্রস্থান। বাইরে গিয়ে আবার হুঁকা ধরাবে।) জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি — আমাকে ডাকছেন পীরসাহেব?

বহিপীর — বলি, এতটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে কেন? খোদার উপর আস্থা রাখিবেন।

হাতেম আলি — জি, পীরসাহেব আস্থা রাখছি বৈকি।

বহিপীর — তাঁহার ছেফাত যেমন অসাধারণ, তেমনি অসংখ্য। তাঁহার স্বরূপ আমাদের কল্পনাতীত কিন্তু তাঁহার ছেফাতের এক-আধটু পরিচয় আমরা সকলেই পাই। তাহার জন্য এবাদত করিতে হয় না। তাঁহার ছেফাতের উপর আস্থা রাখিবেন।

হাতেম আলি — সব আস্থা আছে পীরসাহেব, সব আস্থা আছে। কিন্তু এই যে রাতটি ক্রমে ক্রমে গভীরতর হচ্ছে আর তার মুহূর্তগুলি একটার পর একটা নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে, এ রাতটিকে তো এড়াতে পারব না, এ রাতকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। পারবে কি পীরসাহেব?

বহিপীর — খোদা কী না পারেন জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি — (ব্যঙ্গ করে) জমিদার সাহেব। ডাকটা এখন কেমন ঠাট্টার মতো শোনায়। জমিদারি নাই, তবু জমিদার।

বহিপীর — আমি তা মনে করি না। জমিদার সাহেবকে জমিদার সাহেব ডাকিব নাতো কী ডাকিব?

হাতেম আলি — (একটু হেসে) সেটা আপনার মেহেরবানি পীরসাহেব।

বহিপীর — না, মেহেরবানি নয়, খাঁটি কথা। কারণ, আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি — (চমকে উঠে বিস্ময়ে) আপনার কথা বুঝলাম না পীরসাহেব।

বহিপীর — বলিলাম। আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি — (বিস্ফারিত নেত্রে) পীরসাহেব, আমার মাথার অবস্থা এখন ঠিক নেই। আপনার কথা যেন ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলছেন যে আমার জমিদারি যাবে না?

বহিপীর — ঠিক, আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি — (যেন অলৌকিক দৃশ্য দেখছেন) এ কী কথা বলছেন পীরসাহেব। সে কী করে সম্ভব?

বহিপীর — সম্ভব, সম্ভব। দেখুন আপনি শহরে আসিয়াছিলেন টাকা কর্জ করিতে, কিন্তু আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই, আপনার চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু জমিদারিটা যাওয়া না-যাওয়া কেবল টাকার ওপরই নির্ভর করিতেছে। সে টাকা আমি আপনাকে কর্জ দিব।

হাতেম আলি — পীরসাহেব!

বহিপীর — (মাথা নেড়ে) অধীর হইবেন না। পহেলা আমার কথা শুনুন। হঠাৎ খেয়াল হইল আপনি যেমন আপনার দুঃখে মুষড়াইয়া পড়িয়া বাহ্যিক সব কিছুর প্রতি অন্ধ হইয়া মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছেন, তখন পাশে বসিয়া আমিও আমার সমস্যায় লিপ্ত। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম দুঃখের কারণ যদি এক না হয়, তবে গভীর দুঃখগ্রস্ত দুটি লোকের মতো অপরিচিত আর কেহ নাই। পাশাপাশি বসিয়াও দুইজনের মধ্যে যেন আসমান-জমিনের প্রভেদ। আমার পাশে বসিয়াই আপনি গভীর বেদনা ভোগ করিতেছেন: যেহেতু জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার মান-সম্মান খোরাকির ব্যবস্থা সব হারাইতে বসিয়াছেন। জমিদারিই হইল আপনার মূল। মূল কাটিয়া ফেলিলে বৃক্ষ দাঁড়াইতে পারে না; সব বুঝিয়া এবং আপনার পাশে বসিয়া থাকা সত্ত্বেও আপনার দুঃখ আমার মনে কোনো প্রকার দাগ কাটিতেছে না। উহার কারণ আমিও সমস্যাজর্জরিত। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছি। বিবির সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই তিনি পালাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভাগ্যের কী খেলা আর খোদার কী মর্জি, তাঁহাকে এই বজরাতেই পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাও ঘটিল; বলিতে লজ্জা নাই, তাঁহাকে দেখার পর আমার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল যে, তাঁহাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না। যে করিয়াই হোক, তাঁহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। কিন্তু সমস্যা গুরুতর। তাঁহাকে

টলাইতে পারি না, তিনি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পানিতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। অবশ্য জোর-জুলুম করা যায়। জোর-জুলুম করিয়া পাগলা হাতিকেও বশ করা যায়, কিন্তু মানুষ তো আর জন্তু নয়। ভাবিলাম, অন্য কোনো পথ ধরিতে হইবে। আরও ভাবিলাম, আপনি ও আমি এক কামরায় বসিয়াও একাকী দুঃখ ভোগ করিতেছি, কেহ কাহার সাহায্যে লাগিতেছি না। ভাবিলাম, আমাদের দুইজনের সমস্যাকে জড়িত করিলে দুইজনের সমস্যারও হয়তো সমাধান হইতে পারে, না হইলেও অন্ততপক্ষে দুঃখে মিলিত হইয়া আমরা পরস্পরের দিলে কিছুটা শক্তি আনিতে পারি। আপনি আমার কথা বুঝিতেছেন তো?

হাতেম আলি — এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু মন দিয়ে শুনছি পীরসাহেব।

বহিপীর — আরও বলি, শুনুন। লোকেরা বলে, খোদা আমার দেলে রুহানি শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সে কথা আমি জানি না। আমি উদার লোক। বহুরুপীকে যেমন বহুরুপী হইবার জন্য সঙ সাজিতে হয়, তেমনি পীর হইতে হইলে তাহাকে পীরের সঙ ধরিতে হইবে–এ কথা আমি মানি না। কিন্তু রুহানি শক্তি থাকুক বা না থাকুক, আমি টক করিয়া মানুষের মনের কথা বুঝিতে পারি। শুধু এক নজর দেখিলেও বিবিকে আমার চিনিতে দেরি হয় নাই। স্নেহবিবর্জিতভাবে সৎমায়ের ঘরে মানুষ-হওয়া আমার মাতৃহারা বিবিটি জীবনে কখনো স্নেহ-মমতা পান নাই। দায়িত্বের খাতিরে তাঁহার বাপজান তাঁহার ভরণ-পোষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্নেহ-মমতা দেন নাই। দায়িত্বের খাতিরে দায়িত্ব পালন করা আর স্নেহ-মমতার খাতিরে দায়িত্ব পালন করার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। কাজেই যেখানেই আমার বিবি একটু স্নেহ-মমতার আভাস পাইবেন, সেখানেই তাঁহার সমস্ত দিল হইতে কৃতজ্ঞতা উথলাইয়া উঠিবে। এ কৃতজ্ঞতার তেজ নেশার মতো। ইহার ঘোরে মানুষ অনেক কিছুই করিতে পারে। কাজেই আপনাদের নিকট তিনি যে সামান্য স্নেহ-মমতার আভাস পাইয়াছেন, তাহারই প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে যাহাই বলিবেন তিনি তাহাই করিবেন।

হাতেম আলি — পীরসাহেব, মেহেরবানি করে আরও খুলে বলুন।

বহিপীর — আসল কথা বলিবার আগে আরেকটা কথা বলিয়া লই। আপনি ভাবিতে পারেন, আমি পীর মানুষ, আমি অত টাকা কোথায় পাইব যাহার দ্বারা আপনার জমিদারি উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু খোদা আমাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়াছেন। তা ছাড়া খোদারই মর্জি, তিনি আমাকে অনেক ধনী মুরিদও দিয়াছেন, যাঁহাদের কাছে হাত পাতিলেই যাহা চাহিব তাহাই তাঁহারা দিবেন। মাটিকে সোনা করিবার কেরামতি আমার জানা নাই, কিন্তু একবার মুখ খুলিয়া চাহিলেই আমার মুরিদগণ ভিটাবাড়ি বন্ধক দিয়া হইলেও আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কিন্তু আমি কখনো কাহার কাছে এমন অনুরোধ জানাই নাই। আমার অর্থের কী প্রয়োজন। যাহা আমার আছে তাহাও আমি বিলাইয়া দিতে পারি। এক এক সময় ভাবি, সব ছাড়িয়া ফেলিয়া সত্যিই চলিয়া যাই যেদিকে চোখ যায়, গুহা-গহ্বরে, অরণ্য-পর্বতে ও ইরান-তুরান-কাবলিস্থানে—যেখানেই নিরিবিলি একাকী খোদার এবাদত করা যায়। কিন্তু উহা স্বপ্ন, পীরের স্বপ্ন থাকে। আসলে আমি ইহাই ভাবি যে, সমস্ত ত্যাগ করিলে এবাদত হয় না, কারণ সমস্ত ত্যাগ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, অমানুষে পরিণত হয়। শূন্যতার মধ্যে শূন্যতাই সম্ভব; যেখানে রুহ-এর মুক্তি মিলে না। তাহা হইলে খোদা কেবল আসমানই সৃষ্টি করিতেন, জমিন করিতেন না। অবশ্য অর্থ-যশ-মানের লোভ ত্যাগ করিতেই হয়, কিন্তু জীবনে সামান্য ঘনিষ্ঠ স্নেহ-মমতার সিঞ্চন না থাকিলে কোনো এবাদতই সম্ভব নয়। পানির অভাবে বৃক্ষ যেমন শুকাইয়া মরিয়া যায়, তেমনি সামান্য স্নেহ না থাকিলে রুহও মরিয়া যায়। তখন এক ঢোক পানি না পাইলে ঐশী প্রেমের সাধনা করা যায় না। সেই কারণেই আমি আমার বিবিকে চাই। আপনি অবশ্য বলিতে পারেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই না কেন, যাইতাম, যদি না তাঁহার মধ্যে একটি অসাধারণ নারীর পরিচয় পাইতাম।

পালাইয়া যাওয়া কাপুরুষের লক্ষণ, পালাইয়া যাওয়াটা অতি সহজও। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি পালাইয়া অতিশয় বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সহজ এই কাজটা কেহ কোনো দিন করিতে পারে না বলিয়াই তাহা করিয়া তিনি অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাকে আমি কী করিয়া ফেলিয়া যাই? আমি এখনো জানি যে, জীবনে কখনো স্নেহ-মমতা না পাওয়ার জন্য তিনি এই কথা সহজে বিশ্বাস করিতে চান না যে, তাহা সত্যই পাওয়া যায়। সেই জন্যই তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু একবার কোনো প্রকারে আমি যদি তাঁহাকে আমার স্নেহ-মমতার পরিচয় দিতে পারি, তিনি আমার নিকট হইতে আর পালাইতে চাহিবেন না। সেই পরিচয় দিবার একটা সুযোগই আমি চাই, এবং সেই কারণেই আপনার সমস্যা আর আমার সমস্যাকে মিলিত করিতে উদ্‌গ্রীব। এইবার আমার প্রস্তাবিত কথা আপনাকে বলি, শুনিতেছেন জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি — জি পীরসাহেব, শুনছি, মন দিয়ে শুনছি।

বহিপীর — প্রশ্ন করি বলিয়া তাহা মনে করিবেন না। সারা জীবন বাঁধা-ধরা কথা বলিয়াছি, লোকেরা শুনিয়াছে কী শুনে নাই, তাহা লইয়া বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই নাই। কিন্তু অকস্মাৎ কখনো মৌলিক কথা বলিতে থাকিলে ভয় হয় উহা বুঝি কেহ শুনিল না। দুনিয়ায় হাজার হাজার লোক লক্ষ লক্ষ ফুলগাছ রোপণ করে, আপনি আপনার আঙিনার একটি গাঁদা ফুলের গাছ রোপণ করিলেও তাহা সকলকে ডাকিয়া দেখাইতে আপনার ইচ্ছা হয়। যা হোক আমি বলিয়াছি, আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব। এই শহরেই আমার জনা তিনেক ধনী মুরিদ আছেন। তাঁহাদের কাছে চাহিলেই পাইব। সে টাকা দিয়া আপনি আপনার জমিদারি বাঁচাইতে পারিবেন, উহা আর নিলামে উঠিবে না। তবে একটা শর্তে আপনাকে টাকা কর্জ দিব। তাহেরা বিবিকে আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

হাতেম আলি — (বিস্ময়ে) এই শর্তে যে আপনার বিবিকে আপনার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে?

বহিপীর — (জোর দিয়ে) জি, আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব এই শর্তে যে আমার বিবি আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন।

হাতেম আলি — (ইতস্তত করে) আমাকে মাফ করবেন পীরসাহেব, কিন্তু আমি যেন কিছুই আজ বুঝতে পারছি না। আমার জমিদারি থাকা না-থাকার সঙ্গে তাঁর যাওয়া না-যাওয়ার কী সম্পর্ক?

বহিপীর — বেয়াদবি মাফ করিবেন, কিন্তু বিপদে পড়িয়া মানসিক দুঃখকষ্টের ফলে আপনার মস্তক যেন ঘোলাটে হইয়া আছে। তাই আপনার বুঝিতে সময় নিতেছে। যান, সময় বেশি নাই। আপনি ভিতরে গিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া আমার বিবি সাহেবকে কথাটা বলুন। হকিকুল্লাহ্। (হকিকুল্লাহ্ এলে) পিঠটা একটু ভালো করিয়া টিপিয়া দাও। কেমন ব্যথা করিতেছে। (টিপতে শুরু করলে থেকে থেকে বহিপীর আনন্দধ্বনি করবেন) আর দেরি করিবেন না, জমিদার সাহেব, যান ভিতরে গিয়া বলুন। (হাতেম আলি আস্তে উঠে পাশের ঘরে যান। মুখ ভারাক্রান্ত, হাশেম উঠে বসে তাঁর দিকে তাকায়, খোদেজাও।)

হাতেম আলি — (বেঞ্চিতে বসে; তাহেরার দিকে তাকিয়ে) মনের চিন্তায় ছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে আপনার খোঁজখবর নিতে পারি নাই। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমার চিন্তার কারণ। আমাদের এত পুরনো জমিদারি ওঠে ওঠে। আগামীকালই তার নিলাম ওঠার তারিখ।

তাহেরা — (আস্তে) জি, শুনেছি।

হাতেম আলি — শহরেও টাকার ব্যবস্থা হলো না; যদিও অনেক আশা ছিল যে হবে। বন্ধু আনোয়ার উদ্দিন সাহায্য করতে পারলেন না। আমি চোখে আঁধার দেখছিলাম। এমন সময় পীরসাহেব আমাকে টাকা কর্জ দিতে রাজি হলেন। আমি তাঁর কাছে টাকা চাই নাই, তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিতে চেয়েছেন।

হাশেম — পীরসাহেব টাকা দিতে চেয়েছেন।

খোদেজা — খোদা, খোদা। সবই খোদার রহমত।

হাতেম আলি — কিন্তু একটা শর্ত আছে। পীরসাহেব আমাকে টাকা কর্জ দেবেন এই শর্তে যে আপনি তাঁর সঙ্গে ফিরে যাবেন। কিন্তু এই শর্তের আমি কোনোই অর্থ বুঝি না। আপনার সঙ্গে আমার জমিদারির কী সম্পর্ক? তা ছাড়া আপনি এখানে মেহেরবানি করে আশ্রয় নিয়েছেন বটে, কিন্তু আপনি কী করবেন কোথায় যাবেন তার সঙ্গে এ জমিদারির কী সম্বন্ধ? কাজেই এটি কেমনতর শর্ত আমি বুঝতে পারছি না। পীরসাহেব না বলে অন্য কেউ এমন কথা বললে মনে করতাম ঠাট্টা করছেন।

[কয়েক মুহূর্তব্যাপী স্তব্ধতা]

তাহেরা — না, পীরসাহেব ঠাট্টা করছেন না। পীরসাহেব বুদ্ধিমান লোক। কেবল তিনি এবার অন্য এক ধরনের চাল চালছেন।

হাশেম — (ফেটে পড়ে) চাল, কী চাল?

তাহেরা — বুঝতে পারছেন না?

[আবার স্তব্ধতা]

হাশেম — আব্বা, বুঝেছি কিস্তিমাৎ করা চাল। যে কথা আপনিও বোঝেননি আমি বুঝিনি, সে কথা পীরসাহেব ঠিক অনুমান করেছেন। তিনি ঠিক বুঝেছেন যে তাঁর বিবি ঘর ছেড়ে পালাতে পারেন। যদিও জানেন না কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, এমনকি তিনি পানিতে পড়ে আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত, কিন্তু একটি নির্দোষ পরিবারকে তিনি ধ্বংস হতে দিতে পারেন না, যদি সেই পরিবারকে রক্ষা করার একমাত্র চাবি তাঁরই হাতে তুলে দেওয়া যায়। কেবল তাঁরই জন্য একটি পরিবারকে তিনি উচ্ছন্নে যেতে দিতে পারেন না।

হাতেম আলি — এ কী আবার নতুন সমস্যা। নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য একটি লোক আরও কত রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

হাশেম — (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) আমাদের বাঁচানোর দায়িত্ব এখন আপনার। বড় কঠিন দায়িত্ব; এ দায়িত্ব রক্ষা করতে হলে যেখান থেকে প্রাণপণে ছুটে পালিয়েছেন, সেখানে এবার আপনাকে ফিরে যেতে হবে।

খোদেজা — খোদা, খোদা। কী দায়িত্ব, কী শর্ত?

হাশেম — (অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে) আর বুঝে কী হবে আম্মা। তবে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নাই। এবার তিনি ফিরে যাবেন পীরসাহেবের খেদমত করার জন্য, পানিতে আর ঝাঁপ দিতে চাইবেন না, আপনার একমাত্র ছেলেরও মাথা খারাপ করবেন না। আপনি না চাইছিলেন এবার তাই হবে।

খোদেজা — হাশেম, হাশেম, অত অস্থির হস্‌ না, আমার বুক ধড়ফড় করছে।

হাশেম — (মায়ের দিকে দাঁড়িয়ে) আপনি বুঝতে পারছেন না যে পীরসাহেব আমার মুখও বন্ধ করেছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কারও সমর্থন নাই, তবু ভাবছিলাম কিছু একটা করবই । কিন্তু এবার আমার মুখ বন্ধ হলো। আমিই একমাত্র তাঁর দলে ছিলাম, এবার তাঁর পক্ষ হয়ে আমার বলার কিছু থাকল না। আমি কী করে এবার বলি আপনি পালান, যাবেন না পীরসাহেবের সঙ্গে, মানবেন না তাঁর শর্ত, যাক আমার বাপের জমিদারি ধ্বংস হয়ে। আমার বাপের মনে যে সামান্য আশার সঞ্চার হয়েছে, এত গভীর নিরাশার মধ্যে সামান্য একটু যে— আলো দেখা দিয়েছে, সে আলোকে ধূলিসাৎ করে আপনি পীরসাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিন। উনি নিশ্চয়ই তা করতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁকে আর সে কথা বলতে পারি না।

খোদেজা — হাশেম, হাশেম, তুই একটু চুপ করে বস, হাশেম!

হাশেম — (তাহেরার সামনে দাঁড়িয়ে) কী করতে চান আপনি? শুনলেন তো শর্ত, জানেন তো কীভাবে বাঁচবে আমাদের জমিদারি।

তাহেরা — কী আর করব (একটু হেসে) যে লোক বৃদ্ধ হয়েও এত বুদ্ধিমান তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

খোদেজা — এই যে মেয়েটি হাসছে। তার মনে চিন্তা নাই, আর আমার ছেলেটি পাগলের মতো লাফালাফি চেঁচামেচি করছে।

হাশেম — (সে কথায় কান না দিয়ে তাহেরার দিকে চেয়ে) রহস্য করবেন না, পরিষ্কার করে বলুন, কী করতে চান?

তাহেরা — (গম্ভীর হয়ে) বলছি, বলছি। (যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ ভেঙে পড়ে কাঁদতে শুরু করে। আবার কয়েক মুহূর্তব্যাপী নীরবতা।

হাশেম — আব্বা! দেখুন উনি কাঁদছেন।

তাহেরা — (সংযত হয়ে) না না এমনি কান্না এলো। আমি বলছি, এত চেঁচামেচি করলে কী করে বলি।

খোদেজা — হাশেম তুই চুপ করে থাক। এখানে তোর আব্বা আছেন, তিনি সব বোঝেন। কিছু বলতে হলে তিনিই বলবেন। (হঠাৎ বেঞ্চিতে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

তাহেরা — পীরসাহেব যা চান তাই হবে। তাঁকে বলুন, আপনাকে টাকা দিলে তাঁর সঙ্গে আমি ফিরে যাবো। কিন্তু আগে তাঁকে টাকা দিতে হবে, তারপর আমি যাব।

হাতেম আলি — হাশেম কী করব? (হাশেম নীরব থাকে)

খোদেজা — হাশেমকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? ও বলার কে?

হাতেম আলি — একজন চেঁচামেচি করে আর একজন কাঁদে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নিজেকে যেন কসাইর মতো মনে হচ্ছে। (হঠাৎ আত্মসংবরণ হারিয়ে) আমি আর কত পারি, বাবা। তোমরা যদি বুঝতে এত দিন কী দোজখ গেছে আমার ওপর দিয়ে, কী যাতনায় ভুগেছি একা একা, জমিদারি হারানো কী সহজ কথা।

তাহেরা — আপনি অমন করবেন না। পীরসাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি শর্ত মেনে নিতে রাজি আছি। আর ভাববেন না এ বিষয়ে।

হাশেম — (আপন মনে) আশ্চর্য, শুধু কতগুলো টাকার ওপর এতগুলো জীবন নির্ভর করছে। হয় এটি ধ্বংস হবে, না হয় ওটি ধ্বংস হবে। আর, আর আমার কিছু বলার নেই। কিছুক্ষণ আগেও ছিল, এখন আর নাই।

খোদেজা — আমিই বলি। আমি অত প্যাঁচের ধার ধারি না। পীরসাহেব নেক মানুষ, তিনি ভালোই করতে চান। আমাদেরও, তাঁর বিবিরও। জমিদারি গেলে আমাদের সব যাবে, কিন্তু সে ফিরে গেলে তার কিছু ক্ষতি হবে না। বরঞ্চ সে মান, যশ, সুখ, সম্পত্তি সব পাবে। তিনি যদি না বাঁচান তবে কে তাঁকে বাঁচাবে? তিনি তাঁর জন্য যা করেছেন, তা কেউ কারও জন্য করেন না। মেয়েটা বোকা, তাই বোঝে না। দুঃখ হলো এই যে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন বুদ্ধি হারিয়েছি। এতে এত ভাববার কী আছে?

হাশেম — (ব্যাঙ্গের সুরে) না না, ভাববার কী আছে, আমাদের ভাববার কিছুই নাই।

[এ কামরায় এরপর সবাই ভাবে]

বহিপীর — ঐ ঘরে একবার যে যায় সে আর সহজে ফিরতে চায় না। কী হইল জমিদার সাহেবের? (থেমে) হকিকুল্লাহ্, হয়তো তোমাকে একটু বাহির হইতে হইবে। রাতেই তাহাদের বলিয়া রাখা সমীচীন হইবে, সময় তো বেশি নাই।

হকিকুল্লাহ্ — জি হুজুর!

বহিপীর — পাশের ঘরে কোনো আওয়াজ নাই। সকলে মিলিয়া কী করিতেছে? গোপনে-গোপনে শলাপরামর্শ আঁটিতেছে না তো? কী মতলব তাহাদের?

হকিকুল্লাহ্ — হুজুর, কী করে বলব কার মনে কী?

বহিপীর — (রেগে) তুমি তো কখনোই বলিতে পারো না। অপরের মাথায় সুড়ঙ্গ কাটিয়া প্রবেশ না করিলে যেন মনের কথা জানা যায় না। তওবা, তওবা পিট জোরে টিপ।

তাহেরা — (জেগে উঠে) সত্যিই আর ভাববার কিছু নাই। যান, পীরসাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি রাজি আছি।

হাতেম আলি — (খোদেজার দিকে তাকিয়ে) আপনি কী বলেন?

খোদেজা — আমি তো বলেছি। মেয়েটি বুঝতে পারছে না যে পীরসাহেব তার ভালোর জন্যই এত সব করছেন। যে রাস্তার মেয়েলোকের মতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় তার ভালোর জন্যই তিনি যে এতটা করেছেন, তা বড় জোর-কপালের কথা। অন্য কেউ হলে এমন মেয়ের জন্য এক পাও নড়ত না। তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে ভালোভাবে খেয়ে-পরে সে সুখে-শান্তিতেই থাকবে। তা ছাড়া, পীরের ছায়ায় বাস করার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? পীরসাহেব একটা চাল যদি চেলেই থাকেন তবে সেটা সকলের ভালোর জন্যই চেলেছেন। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই তো বুঝি।

তাহেরা — জমিদার সাহেব, তিনি ঠিকই বলছেন। যান, ভাববেন না।

হাশেম — (চিৎকার করে) আব্বা!

হাতেম আলি — (চমকে) কী বাবা?

হাশেম — (সুর বদলে) না, কিছু না। তিনি যা বলছেন তাই করুন।

বহিপীর — (দরজার দিকে তাকিয়ে) কী হইল তাঁহার? জমিদার সাহেব কিছু আসিয়া বলিবেন তো! (খাট্টা মেজাজে) বহুৎ হইয়াছে, হকিকুল্লাহ্, আর নয়। বলিলাম টিপিতে, তুমি কিনা আমার শরীরটা ভর্তা বানাইয়া দিলে। ময়দা নাকি আমার শরীরটা?

হাতেম আলি — (তাহেরার দিকে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে) আর কিছু বলবেন না?

তাহেরা — (মাথা নাড়ে)

খোদেজা — তার কথা যে বলেছে। আপনি যান, গিয়ে বলুন যে রাজি আছে।

হাতেম আলি — (হাশেমের দিকে তাকিয়ে) কী বাবা, উঠতে পারছি না কেন? চক্ষুলজ্জা নাকি?

হাশেম — লজ্জা করে কী হবে, আব্বা? তা ছাড়া করার যখন আর কিছুই নাই তখন চক্ষুলজ্জা অর্থহীন। আমরা যদি দোষী হয়েই থাকি, তবে সে দোষ চক্ষুলজ্জায় ঢাকবে না, বরঞ্চ তাতে দোষটা খুঁচিয়ে বের করে দেখানো হবে।

হাতেম আলি — (দৃঢ়চিত্তে উঠে পড়ে) আচ্ছা যাই। কিন্তু বলুন, আপনি অসুখী হবেন না তো?

তাহেরা — না, অসুখী কেন হব?

হাশেম — (রেগে অসংযত হয়ে) আমাদের মুখে চুনকালি দিয়েছেন। সেটা হজম করেছি আবার মিথ্যা কথা বলে সে চুনকালি রগড়াচ্ছেন কেন?

খোদেজা — হাশেম!

হাশেম — চেঁচান, চেঁচান। এবার জমিদারি তো ফিরে পেয়েছি, আসুন সবাই চেঁচাই। [হাতেম আলি উঠে পাশের ঘরে যান। দরজা আধা-খুলে হাশেম দাঁড়িয়ে থাকে।]

বহিপীর — কী খবর জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি — তিনি যাবেন।

বহিপীর — শোকর আলহামদুলিল্লাহ্। হকিকুল্লাহ্, হকিকুল্লাহ্!

হাতেম আলি — (বাধা দিয়ে) কিন্তু একটা কথা আছে। তিনি রাজি আছেন আমি রাজি নই। আমি এভাবে টাকা নিতে পারব না। যায় যাক জমিদারি।

বহিপীর — ভাবিয়া কথা বলিতেছেন কি?

হাতেম আলি — অনেক তো ভেবেছি এ কদিন ভাবতে ভাবতে শরীরে আর কিছু নাই। কিন্তু হঠাৎ সব ভয় ভাবনা কেটে গেছে, আরও মনে হচ্ছে, নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।

হাশেম — (চেঁচিয়ে) আব্বা! (এগিয়ে আসে)

বহিপীর — ভালো ভালো। যেমন বোঝেন। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

খোদেজা — (লাফিয়ে দরজার কাছে এসে) কী বললেন পীরসাহেবকে?

হাতেম আলি — (হেসে) বললাম, তিনি রাজি আছেন কিন্তু এভাবে আমি টাকা চাই না, যাক জমিদারি।

[খোদেজা থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

বহিপীর — (ঘন ঘন মাথা নেড়ে) হুঁ, বেশ বলিয়াছেন, উত্তম কথা বলিয়াছেন। হুঁ। উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা।

খোদেজা — (চেঁচিয়ে) পীরসাহেব, আমাদের ওপর রাগ করবেন না; আমাদের বদ্‌দোয়া দেবেন না।

বহিপীর — (হঠাৎ রেগে উঠে) আমাকে আপনারা কী ভাবিয়াছেন, আমি পীর হইয়াছি বলিয়া কি মনুষ্য নই? ভাবিতেছেন, আপনারাই সব একেক জন দয়ার সাগর আর আমি একটি হৃদয়হীন পশু, বেদরদ বেশরম জল্লাদ? জমিদার সাহেব বিনা শর্তে আপনি টাকা পাইবেন। ইহা দান নয়, ইহা পীরি বদন্যতাও নয়। আপনাকে ইহা লইতেই হইবে। আমার বিশেষ অনুরোধ।

হাতেম আলি — পীরসাহেব? কী বলছেন আপনি?

খোদেজা — খোদা, খোদা!

বহিপীর — অবাক হইবেন না। অবাক হইবার কিছু নাই। তবে একটা কথা। আমার বিবি সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। সে বিষয়ে আমার কোনো ভুল হয় নাই। কিন্তু জমিদার সাহেবের ব্যাপারে আমি নেহাতই ভুল করিয়াছি। অতি আশ্চর্য, সে বিষয়ে সত্যিই নিঃসন্দেহ ছিলাম। এত নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তাহা এক মুহূর্তের জন্য খেয়াল হয় নাই। আমাকে ভুল মানিতেই হইবে। আর এ কথাও মানিতে হইবে যে, কোনো মানুষ হঠাৎ আশাতীত কাজ করিয়া বসিতে পারে।

হাতেম আলি — পীরসাহেব, এমন কথা বলবেন না।

বহিপীর — না বলিয়া উপায় কী, কিন্তু ইহা প্রলাপ বকার মতো। চিন্তা করিবেন না, টাকা আপনি পাইবেনই।

হাশেম — (হঠাৎ ধৈর্যহারা হয়ে) না, পীরসাহেব, টাকা আমাদের চাই না।

খোদেজা — হাশেম!

হাশেম — (হাতেম আলির দিকে চেয়ে) আব্বা বলে দিন পীরসাহেবকে, বলে দিন যে সত্যই আমরা টাকা চাই না।

খোদেজা — হাশেম, হাশেম।

বহিপীর — (অবাক হয়ে) এখন বাবা কী? আমার আর কোনো শর্ত নাই। সকলে মিলিয়া আমাকে অমানুষে পরিণত করিয়াছেন। জমিদার সাহেবের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল যে তিনি আমার দলে থাকিবেনই, কিন্তু তিনিও আমাকে ঠকাইলেন। আর কিছু না থাকিলেও আমার জোব্বার সম্মান তো দিবেন? না, ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। মনে করিবেন, ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবি। এ দাবি কবুল করিতেই হয়।

তাহেরা — (উচ্চ ধীর কণ্ঠে) দেখুন, আমি একবার যে কথা বলেছি সে কথার ব্যতিক্রম হবে না। আমি যাব।

হাশেম — (চেঁচিয়ে) কী বলেছেন আপনি?

খোদেজা — হাশেম!

তাহেরা — (দৃঢ় কণ্ঠে) আমি যাবই!

হাশেম — (পূর্ববৎ) বুঝতে পারছি, সবার বদান্যতার পরীক্ষা চলছে, বদান্যতার জোরে জান যায় মানুষের; তার নেশায় অন্ধ হয়।, বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তিও হারায়। আপনি ভুল করবেন না। আপনার সত্য পণ এটা নয়। না, আপনাকে নেশায় ধরেছে। আপনি জানেন না যে, এঁরা আপনার জীবন নিয়ে খেলা করছেন। আপনি যেন দাবার গুটি, জীবন নিয়ে খেলা করছেন, বুঝতে পারছেন না সে কথা? না, না, আপনাকে আমি বাঁচাবই। (দ্রুতপায়ে তাহেরার পাশে এসে) চলুন আমার সঙ্গে, চলুন আমরা পালাই; এ বদান্যতা হঠাৎ আপনার কাছে মধুর মতো ঠেকছে; বুঝতে পারছেন না যে, এ বিষ! (হাত ধরে বাইরে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে) আপনাকে নিয়ে যাবই। বলে দিলাম, আপনাকে বাঁচাব। আপনাকে বাঁচাবার সময় আমার হয়েছে। এখন আপনাকে আর ছেড়ে দিতে পারি না।

তাহেরা — (বিস্ময়ে) একি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

হাশেম — কথা বলবেন না। (বেরিয়ে যায়)

খোদেজা — (হাতেম আলিকে) কী করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। থামান তাদের? থামান আমার ছেলেকে?

হাতেম আলি — হাশেম! (দ্রুতগতিতে উঠে দরজার দিকে রওনা হতেই বহিপীর তার হাত ধরে ফেলেন, আর ইশারায় খোদেজাকে ধৈর্য ধরতে বলেন।)

খোদেজা — পীরসাহেব।

বহিপীর — ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন।

[ততক্ষণে হাশেম তাহেরাকে হাত ধরে তীরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাহেরার চলাটা ইচ্ছাকৃত না হলেও সে বিশেষ বাধা দেয় না। কেবল বলতে থাকে, কোথায় যাব? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে? এ ঘরে বহিপীর ব্যতীত আর সবাই বিমূঢ় হয়ে থাকে।]

বহিপীর — (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) এতক্ষণে ঝড় থামিল। তাহারা গিয়াছে, যাক। তা ছাড়া তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল, যাইবেই।

খোদেজা — (অধীর কণ্ঠে) পীরসাহেব! কী হবে আমাদের?

বহিপীর — (হেসে) তওবা তওবা। এত বিচলিত হইবার কী আছে? আমরা সকলে তো রহিলাম। আমরা থাকিব; আপনার জামিদারিও থাকিবে; আমরা আমাদের পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাকি দিন কাটাইয়া দিব। চিন্তার কী কারণ?

খোদেজা — (হঠাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) পীরসাহেব!

বহিপীর – (দেদার হেসে) আপনি এইবার আমাকে বদ্‌দোয়া দিতেছেন। কিন্তু পীরের ঐ এক সুবিধা। কোন বদ্‌দোয়া পীরের গায়ে লাগে না। আসুন জমিদার সাহেব, আমরা আপনার জমিদারি রক্ষার ব্যবস্থা করি। হকিকুল্লাহ্!

[যবনিকা]

শব্দার্থ ও টীকা

বহিপীর	–	পির কথা বলত 'বহি' বা বইয়ের ভাষায়। তাই তার নাম হয়েছে বহিপির। [বর্তমান পাঠে নাটকের নাম হিসেবে লেখকের ব্যবহৃত 'বহিপীর' বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।]
বজরা	–	ভ্রমণ-উপযোগী বিলাসবহুল কাঠের নৌকাবিশেষ।
মুরিদ	–	অনুসারী। পিরের অনুসারী।
লেবাস	–	পোশাক।
জোয়ান	–	যুবক। তরুণ।
সওয়াল	–	প্রশ্ন।
জবান	–	ভাষা। মুখের কথা।
ঢঙ	–	রীতি। এখানে বিভিন্ন রীতির ভাষা চালু থাকার বিষয়ে বোঝানো হয়েছে।
গূঢ়তত্ত্ব	–	গোপন রহস্য।
বরঞ্চ	–	বরং।
ক্ষিপ্র	–	দ্রুত।
সটান	–	সোজাসুজি। টানটান হয়ে।
অন্তঃসারশূন্য	–	ফাঁপা। সারবস্তু নেই এমন।
সংবিৎ	–	হুঁশ। এখানে জ্ঞান ফিরে পাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
খান্দানি	–	খানদান বা জাত ভালো যার। অভিজাত।
আলখাল্লা	–	ঢিলেঢালা জামাবিশেষ।
মকদ্দমা	–	মামলা।
দাওয়াই	–	ওষুধ।
মূর্তিবৎ	–	মূর্তির মতো। স্থির।
সঙ	–	ভাঁড়। সাধারণভাবে সার্কাসে বিচিত্র ধরনের পোশাক পরে দর্শকের মনোরঞ্জন করে এমন ব্যক্তি।
স্বতঃপ্রবৃত্ত	–	স্বেচ্ছায়। নিজের ইচ্ছায়।
সমীচীন	–	যৌক্তিক। যথাযথ।
বিমূঢ়	–	বিহ্বল। বিস্মিত হওয়া।
তরিকাবিহীন	–	আইন ও নীতি বহির্ভূত।
রুহানি শক্তি	–	রুহের শক্তি। আত্মিক ক্ষমতা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। এমন ঝড় কখনো দেখিনি– উক্তিটি কার?

ক. হাশেমের খ. তাহেরার
গ. খোদেজার ঘ. বহিপীরের

২। 'এক-আধটু ঠাট্টা-মস্করা করতেও শুরু করেছে' – কারা এ কাজটি করতে শুরু করেছে?

ক. মাঝিরা খ. সহপাঠীরা
গ. গ্রামের লোকেরা ঘ. যাত্রীরা

৩। নদীতে খালি কী দেখতে পায় তাহেরা?

ক. নৌকা খ. বজরা
গ. পদ্ম পলাশ ঘ. কচুরিপানা

৪। কথ্য ভাষা সম্পর্কে বহিপীরের মত হলো – এটি

i. মাঠ ঘাটের ভাষা
ii. স্রষ্টার বাণী বহন করার উপযুক্ত
iii. খোদার বাণী বহন করার অনুপযুক্ত

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তামশু মহাজনের জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সে কারণে তাঁর মনে শান্তি নেই। বাড়িতে না জানিয়ে তিনি জমি রক্ষার জন্য কোর্টে যান। এসব খরচ জোগানোর অর্থ জোগাড়ের জন্য তিনি বিপথ অবলম্বন করতে গিয়ে বোধোদয় হয়।

৫। উদ্দীপকের তামশু মহাজনের সাথে বহিপীর নাটকের যে চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ–

ক. হকিকুল্লাহ্ খ. হাশেম আলি
গ. হাতেম আলি ঘ. জমিদার গিন্নি

৬। কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে উভয় চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. জমিদারিত্ব রক্ষার জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন।
খ. পীর সাহেবের প্রতারণার শিকার।
গ. সন্তান হারানোর জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন
ঘ. বজরায় দুর্ঘটনার শিকার।

উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাতবর ধূর্তপ্রকৃতির লোক। বয়স হয়েছে অথচ স্বভাব বদলায়নি। বুড়ো বয়সে কবিরউদ্দিনের মেয়েকে বিয়ে করার ব্যবস্থা করে। কিন্তু বিয়ের রাতেই প্রতিবেশি রাজন মেয়েটিকে বিয়ে করে। পরবর্তীতে মাতবর তা মেনে নেয়।

৭। উদ্দীপকের শেষ অবস্থা মোকাবিলার মাধ্যমে বহিপীর নাটকের কোন চরিত্রের মিল আছে?

ক. বহিপীর খ. হাশেম আলি
গ. হাতেম আলি ঘ. হকিকুল্লাহ্

৮। শেষ অবস্থার মোকাবিলায় উভয় চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে তা হলো−

i. বুদ্ধিমত্তা
ii. বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন
iii. মানবিক চেতনা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

আব্দুল্লাহ গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করেন। গ্রামের মানুষ তাকেও পির মনে করেন। কারণ, তাঁর বাবাও পির ছিলেন। সে কারণে গ্রামের একজন বয়স্ক লোক তাঁর পায়ে সালাম করতে যান। কিন্তু আব্দুল্লাহ এসবে বিশ্বাস করেন না। সে জন্য তিনি সালাম করতে না দিলে বয়স্ক লোক মনে করে বেহেস্তের পথটা কঠিন হয়ে গেল।

৯। উদ্দীপকের আব্দুল্লাহের কার্যক্রমে 'বহিপীর' নাটকের বিপরীত বৈশিষ্ট্যের চরিত্রটি হলো−

ক. হাশেম আলি খ. হাতেম আলি
গ. হকিকুল্লাহ্ ঘ. বহিপীর

১০। বহিপীর নাটকের বিপরীতে কার্যক্রমে আব্দুল্লাহ চরিত্রে প্রকাশিত দিকটি হলো −

ক. ধূর্ততা খ. ধৈর্যশীলতা
গ. কুসংস্কারমুক্ত ঘ. ভণ্ডামি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আজাদের বাবা নামকরা পির ছিলেন। কিন্তু আজাদ লেখাপড়া শিখেছেন। শহরে চাকরি করেন। দীর্ঘদিন পর গ্রামে বেড়াতে আসেন। গ্রামের মুরব্বি তার কাছে এসে তাকে সালাম করতে যায়। আজাদ সাহেব নিজেই তাকে সালাম করেন, কিন্তু মুরব্বি এ ঘটনায় নিজেকে পাপী মনে করেন। আরেকজন তার কাছে পানি পড়া নিতে আসে। তাকে আজাদ সাহেব বোঝানোর চেষ্টা করেন।

ক. 'বহিপির' নাটকের প্রথম সংলাপটি কার?
খ. "বিয়ে হলো তকদিরের কথা"− এ কথাটি বুঝিয়ে বলো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামের মানুষগুলোর কার্যক্রমে 'বহিপির' নাটকে প্রতিফলিত সমাজের কোন চিত্রকে ইঙ্গিত করে তা তুলে ধরো।
ঘ. উদ্দীপকের আজাদ চরিত্রটি 'বহিপির' নাটকের বহিপিরের মতো ধর্মব্যবসায়ী নয়−মন্তব্যটি বিচার করো।

২। ভগ্নিপতি মারা যাওয়ার পর মঞ্জুর সাহেব তার ভগিনী মাজেদার দায়িত্ব নেয়। মাজেদাকে সে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। দ্বিতীয়বার ভগিনীকে বিয়ে দিতে অনেক টাকা প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই বাধ্য হয়ে মাজেদাকে এক ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মঞ্জুর সাহেবের স্ত্রী এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করে এবং বিয়ে ভেঙে দেয়।

ক. 'সূর্যাস্ত আইন' কত সালে প্রণীত হয়?
খ. জমিদার হাতেম আলির মনে শান্তি নেই কেন?
গ. উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেবের সাথে 'বহিপির' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো।
ঘ. "মাতৃসুলভ সহানুভূতি থাকলেও উদ্দীপকের মাজেদা চরিত্রটি পুরোপুরি 'বহিপির' নাটকের খোদেজা চরিত্রের মতো নয়"− মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

৩। সুমির বাবা দিনমজুর। যৌতুকের টাকার অভাবে সুমির বাবা বৃদ্ধ মোড়লের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। সুমি রাজি না হয়ে কর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে গেলে সবাই মিলে তাকে ধরে জোর করে বিয়ে দিতে চায়। তখন রাহুল প্রতিবাদ করে এ বিয়ে ঠেকায়। অবশেষে সে নিজেই বিনা যৌতুকে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. নৌকার সঙ্গে কিসের ধাক্কা লেগেছিল?

খ. "এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায় জানতাম না"– এ কথাটি বুঝিয়ে বলো।

গ. উদ্দীপকের সুমি চরিত্রটি 'বহিপির' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা করো।

ঘ. "প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র হিসেবে উদ্দীপকের রাহুল ও 'বহিপির' নাটকের হাশেম আলি অভিন্ন" – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। ক) 'সূর্যাস্ত আইন' জমিদার হাতেম আলীর জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে?

খ) বহিপির ও হাতেম আলীর সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।

২। ক) 'খোদা কাকে কীভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।' – উক্তিটি কার? কেন তিনি এ কথা বলেছিলেন?

খ) 'বহিপির' নাটকে নাট্যকার কোন কোন সামাজিক সমস্যার আলোকপাত করেছেন? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩। ক) তাহেরা কেন বহিপিরের সাথে ফিরে যেতে চেয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

খ) হাশেমকে কি প্রতিবাদী চরিত্র বলা যায়? তোমার মন্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদান করো।

৪। ক) 'কথ্য ভাষা হইল মাঠ ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।' – এ উক্তি কে এবং কেন করেছিল?

খ) 'নাটকে সাহস ও স্বাধীনতার প্রতীক হচ্ছে তাহেরা।' – তাহেরা চরিত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্দেশপূর্বক এ মন্তব্য বিশ্লেষণ করো।

৫। ক) বহিপির চরিত্রের ইতিবাচক উপাদানগুলো বর্ণনা করো।

খ) সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামির যে চিত্র 'বহিপির' নাটকে প্রতিফলিত তার পরিচয় দাও।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : বাংলা সহপাঠ

বই পড়তে যে ভালোবাসে তার শত্রু কম।

– চার্লস ল্যাম্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।